মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-০৩

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

এপ্রিল ২০১৫ ইং, জুমাদাল উখরা ১৪৩৬ হি., চৈত্র ১৪২১ বাং

جمادى الاخرى ١٤٣٦ ابريل ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :............................... ৪

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪ ..... ৫

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১১

মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :

জাতীয় সংকট : সমাধান কোন পথে................. ১২

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :

ইসলামে ছবি ভিডিও ও ভাস্কর্য নির্মাণের বিধান ১৮
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৫........ ২১
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় মাতা-পিতার ভূমিকা.......... ২৫
মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১২...... ৩২
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১১....... ৩৮
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৩

মলফূজাতে আকাবের ৪৭

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শিক সিদ্ধান্ত...

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, পবিত্র ধর্ম ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি নিজেই সংরক্ষণ করবেন। যুগে যুগে দেখা গেছে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মাঝে এমন একটি দলের মাধ্যমেই ইসলামকে সংরক্ষিত রেখেছেন, যারা সঠিক ইসলামী আদর্শকে নিজ জীবনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। কোনো প্রকার শিরক, নেফাক এবং ফিসক যাদের কাছে স্থান পায়নি। প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় লক্ষ করা গেছে, আল্লাহর মনোনীত একটি দল বিশ্বব্যাপী আমূল বিবর্তনের মধ্যেও ইসলামের সঠিক আদর্শ বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করে আছে। যাদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ইসলামকে সঠিক আদর্শের ওপর সারা বিশ্বে টিকিয়ে রেখেছেন এবং দ্বীনি ইলমের প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন। সব কিছুই আল্লাহর শাশ্বত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এই নেজামের দিকেই ইশারা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

'তাদের প্রতিটি দলের একটি অংশবিশেষ দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য কেন বের হচ্ছে না, যাতে তারা স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করে তাদের ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে; যেন তারা বাঁচতে পারে (সূরা : তাওবা : ১২২)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো তারা, যারা কোরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারী)

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর সাহচার্য পেয়ে উম্মতের সর্বোত্তম দল হিসেবে বিবেচিত। দৈনন্দিন জীবনে তাদের কাজ ছিল ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং ইসলামকে বিজিত করার প্রচেষ্টা। যারা তাঁদের অনুগামী হয়েছেন তথা তাবেঈন এবং যারা তাঁদের অনুগামী হয়েছেন তথা তবেতাবেঈন তাঁদেরও প্রচেষ্টা ছিল দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় এর প্রচার-প্রসার ঘটানো। নবীজি (সা.)-এর যুগের কাছে হওয়ায় তাঁদের ব্যাপারে স্বতন্ত্র মর্যাদার ঘোষণা দিতে গিয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'উত্তম যুগ হলো সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তবেতাবেঈনের যুগ'। এই তিন যুগের লোকেরা ওপরে উল্লিখিত হাদীসের ব্যাপকতা হিসেবেও উত্তম আবার রাসূল (সা.)-এর দেওয়া স্বতন্ত্র ঘোষণা হিসেবেও উত্তম। সে হিসেবে তাঁরা সর্বোত্তম। এর পরের প্রজন্মের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন যাঁরা দ্বীনি শিক্ষায় নিয়োজিত থাকেন তাঁরা। যারা দ্বীনি ইলম শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয় তাদের ব্যাপারে অগণিত ফজীলতের কথাও পবিত্র কোরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এর একটা বড় কারণ হলো, দুনিয়ায় ইসলাম টিকে থাকার জন্য আবশ্যক বিষয় হলো ইসলামী শিক্ষা। সঠিক ইসলামী শিক্ষা যত দিন টিকে থাকবে, ইসলাম সঠিকভাবে টিকে থাকবে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যত দিন ইসলামকে টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা করবেন, ইসলামী শিক্ষাও তত দিন টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন হলো, ইসলামী শিক্ষা কিভাবে টিকে থাকবে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার নববী পদ্ধতি হলো সুফফা মাদরাসা। এর পরে একই আদলে সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মাদরাসা। সে আদলেই শিক্ষা বিস্তার করে আসছিলেন তাবেঈন, তবেতাবেঈন এবং এর পরবর্তী ইসলামের কর্ণধারগণ। যার ধারাবাহিকতায় বর্তমান দেওবন্দী মাদরাসা।

উপমহাদেশে দীর্ঘ ইংরেজ শোষণের অক্টোপাসে আক্রান্ত ক্ষতবিক্ষত ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণ আরম্ভ হয় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সেটিই আপন শাখা-প্রশাখায় সারা দুনিয়ায় দেওবন্দী মাদরাসা রূপে আবির্ভূত হয়। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এই মাদরাসা পদ্ধতি গড়ে ওঠে রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবেতাবেঈনের আদর্শের মূর্তপ্রতীক হিসেবে। যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হলো সঠিক ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, আদর্শ মানব গঠন, মুসলমানদের মাঝে প্রকৃত মানবতাবোধ জাগ্রতকরণ এবং মুত্তাকী, পরহেজগার আল্লাহওয়ালা, জাতি-দেশপ্রেমিক মানুষ তৈরি, তাই এসব মাদরাসার পাঠ্যসূচি সেই আদলেই প্রতিষ্ঠিত, যা শাশ্বত এবং তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সব সময় সফলকাম।

শত শত বছরের বাস্তবতা হলো, এসব মাদরাসায় পড়ুয়ারা আদর্শের হাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত হয়ে গড়ে ওঠে এবং বেড়ে ওঠে। লাখো যুবকের একটি মিছিলকে নিরাপদ জীবনযাপনে একমাত্র আদর্শের হাতে নিয়ন্ত্রিত রাখার যে নজির দেওবন্দী মাদরাসাগুলো স্থাপন করেছে, তা অন্য ক্ষেত্রে বিরল বললেও অত্যুক্তি হবে না।

সুতরাং এসব মাদরাসা তাদের গৃহীত আদর্শের ওপর যত দিন দৃঢ়পদ থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের মাধ্যমেই দ্বীনে ইসলামকে টিকিয়ে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। তবে তারা যদি আদর্শচ্যুত হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের ওপর অন্যকে চাপিয়ে দেবেন বৈকি?

এর একটি আদর্শ হলো সাধারণ মানুষের আন্তরিক ও

খুলুসিয়্যাতপূর্ণ অর্থায়নেই এসব মাদরাসা চলবে। যে অর্থের পাশাপাশি কারো প্রভাব বা স্বার্থ বিস্তৃত হবে সেরূপ অর্থ দিয়ে এসব মাদরাসা তার স্বতন্ত্র আদর্শের ওপর চলতে পারবে না। সে কারণে কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার বা স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এসব মাদরাসায় দান করা হলে তা তারা গ্রহণ করতে পারেন না। সেটা সরকারের পক্ষ থেকে হোক কিংবা অন্য কারো পক্ষ থেকে।

এই সাহসিক আদর্শেরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে কয়েক দিন আগে সকলের মাদরে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দ বিশ্বকে জানান দিয়েছে যে, এসব মাদরাসা অর্থ বা ক্ষমতার লোভে করা হয় না। বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং রাসূল (সা.)-এর তরিকা বাস্তবায়ন উদ্দেশ্যেই এসব মাদরাসা চালানো হয়।

গত ২৭/০৩/২০১৫ জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, 'ভারতের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষপ্রতিষ্ঠান, দেওবন্দের দারুল উলূম সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের অধীনস্থ মাদরাসাগুলোতে শিক্ষার আধুনিকীকরণের জন্য তারা কোনো সরকারি অনুদান নেবে না।'

ভারত সরকার এ বছর তাদের বাজেটে মাদরাসা শিক্ষার সংস্কারের জন্য ১০০ কোটি রুপি বরাদ্দ করেছে; কিন্তু দারুল উলূম মনে করছে এই সরকারি সহায়তা নিলে তাদের মাদরাসাগুলোয় যে ধর্মীয় শিক্ষার পরম্পরা আছে, তা ব্যাহত হবে।

ভারতভিত্তিক কওমী মাদরাসা সংগঠন রাবেতা-ই-মাদারিস-ই-ইসলামিয়ার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দেওবন্দের ক্যাম্পাসে।

সেখানে চার হাজারেরও বেশি উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে দারুল উলূম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের শিক্ষা পদ্ধতি বা সিলেবাসের ব্যাপারে কারো প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা গ্রহণ করা হবে না, আর তাই তাদের মাদরাসাগুলো এ জন্য সরকারি অনুদানও প্রত্যাখ্যান করবে।

দারুল উলূমের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজী এর কারণ ব্যাখ্যা করে বিবিসিকে বলেছেন, 'দেড় শো বছরের পুরনো এই প্রতিষ্ঠান তাদের ইতিহাসে কখনও সরকারি অনুদান নেয়নি, ভারতেরও না, বাইরের কোনো সরকারেরও না। দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতারাই এই বিধান করে গেছেন। কারণ সরকারের টাকা নিলে তাদের কথাই তো আমাদের শুনতে হবে, আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারাব!'

বস্তুত সরকার দেশের যেসব মাদরাসায় নাক গলিয়েছে, সেখানে পড়াশোনা লাটে উঠেছে বলেই দাবি করছেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, 'সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদরাসায় পড়াশোনা কিছু হয় না, সেখানে শিক্ষকরা শুধু সরকারের কাছ থেকে মাইনে পেয়েই খালাস। তাদের পড়াশোনার তাগিদ থাকে না, ছাত্রদেরও শেখার গরজ থাকে না। দেশে সবচেয়ে বেশি সরকারি অনুদান পাওয়া মাদরাসা আছে বিহারে, সেগুলোর সবই একেবারে মৃতপ্রায় দশা!

বস্তুত দারুল উলূমের প্রধান আশঙ্কা এটাই, সরকারি অর্থ নিলে তাদের পাঠ্যক্রম বা পড়াশোনাতেও সরকার নাক গলাবে। দারুল উলূমের উপাচার্য মুফতী আবুল কাশেম নোমানি সাহেবও জানিয়েছেন, আধুনিকতার নামে তারা তাদের মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষার বিশুদ্ধতা নষ্ট করতে পারবেন না।'

বাংলাদেশেও মাশাআল্লাহ এখন হাজারো দেওবন্দী মাদরাসা। লক্ষ লক্ষ ছাত্র এসব মাদরাসার অধীনে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করে থাকে। নিজেদের আদর্শ এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়েই এসব মাদরাসা চলে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের খুলুসিয়্যাতপূর্ণ অর্থায়নে পরিচালিত হয় এসব মাদরাসা। এ দেশের সরকার ও বিরোধী দল থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের মুসলমান স্থানীয়ভাবে এসব মাদরাসার খোঁজখবর রাখেন। সুখে-দুঃখে তাঁরা পাশে থাকেন। সকলে সঠিক ইসলামী শিক্ষার বিস্তার চায় বলেই এসব মাদরাসার প্রতি সকলে ধাবিত। বেশির ভাগ মাদরাসার পরিচালনা কমিটি গঠিত হয় দেশের বরেণ্য আলেমদের নিয়েই। তবে কিছু মাদরাসা আছে, যেগুলোর কমিটিতে দেশের বড় বড় রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগী এবং পেশাজীবীও আছেন। দ্বীনের প্রতি তাঁদের অনুরাগ এটুকুতেই প্রতীয়মান হয় যে তাঁরা কেউ মাদরাসাগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে চান না। যে যে মতাদর্শেরই হোক না কেন মাদরাসার পরিবেশ-প্রতিবেশ, তারবিয়াতী পদ্ধতি, শিক্ষানুক্রম সবই তাঁদের কাছে পছন্দ। এরূপ সদ্ভাব এবং ধর্মানুরাগ মুসলিম উম্মাহের জন্য বড়ই আশার বাণী।

তবে এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসাগুলো আপন আদর্শের ওপর টিকে থাকাই মূল বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন মাদরাসা পরিচালনা, শিক্ষা কারিকুলাম, তারবিয়াত প্রদানে দারুল উলূম দেওবন্দের অনুসরণে অটল ও অবিচল থাকা। যত দিন এই মাদরাসাগুলো আপন আদর্শে টিকে থাকবে ষড়যন্ত্রকারীরা যত ষড়যন্ত্রই করুক মাদরাসার কোনো ক্ষতি হবে না বরং নিজেদের কুড়ালের আঘাত নিজের পায়েই প্রতিঘাত করবে। দেওবন্দী মাদরাসা টিকে থাকবে চিরদিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলামকে টিকিয়ে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। তাই আমরা মনে করি, দেওবন্দী মাদরাসাগুলোর নিজেদের আদর্শের ব্যাপারে যথাসম্ভব রক্ষণশীল হওয়া জরুরি।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৮/০৩/২০১৫ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (সূরা নূর ৩০)

আলোচ্য আয়াতে يغضوا শব্দটি غض থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কম করা এবং নত করা।–(রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এই তাফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ নিয়্যতে দেখা হারাম এবং বদনিয়্যত ছাড়া দেখা মাকরূহ–এই বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখা ও এর মধ্যে দাখিল (চিকিৎসা ইত্যাদির কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত)। এ ছাড়া কারও গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

ويحفظوا فروجهم যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এই দুটিকে স্পষ্টত উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (রহ.) হযরত ওবাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, كل ما عصى الله به فهو كبيرة وقد ذكر الطرفين অর্থাৎ যদ্দ্বারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয় তা-ই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত–সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন–

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও আমার ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোনো বেগানা নারীর ওপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। (ইবনে কাসীর) হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে গোনাহ। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

এর পরের আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ–

অর্থাৎ ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে...। (সূরা নূর ৩১)

এই আয়াতে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জোর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে মাহরাম ব্যতীত কোনো পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলিমের মতে, নারীদের জন্য হারাম নয় এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম। কাম ভাব সহকারে বদ নিয়্যতে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। হাদীসে এসেছে, একদিন হযরত উম্মে সালামা ও মায়মূনা (রা.) উভয়েই রাসূল (সা.)-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম তথায় আগমন করলেন। এ ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে সালামা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো অন্ধ। সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তো দেখছ। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

অন্য কয়েকজন ফিকাহবিদ হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দূষণীয় নয়।

তবে এ ব্যাপারে সকলে একমত যে কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম।

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

হাদীস নং ৯ :

عن معاوية رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ :مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا :جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ :آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا :وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ :أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদেরকে কোন জিনিস এখানে জমায়েত করেছে। তাঁরা বললেন, আমরা আল্লাহ তা'আলার যিকির করছি এবং এ জন্য তাঁর হামদ ও সানা করছি যে তিনি আমাদেরকে ইসলামের দৌলত দান করেছেন। এটি আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার বড়ই ইহসান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! তোমরা কি শুধু এ জন্যই বসে আছ? সাহাবীগণ বললেন–জি, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম আমরা শুধু এ জন্যই বসে আছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাদের প্রতি কোনো খারাপ ধারণার কারণে তোমাদেরকে কসম দেই নাই বরং হযরত জিবরাঈল (আ.) এই মাত্র আমার নিকট এসেছিলেন এবং তিনি এই খবর শুনিয়েছেন যে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের ওপর গর্ব করছেন।

(সহীহ মুসলিম ২/৩৪৬ হা. ৬৮৫৭, সুনানে তিরমিযী ২/১৭৫ হা. ৩৩৭৯, মুসনাদে আহমদ ৪/৯২ হা. ১৬৮৪১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১০/৩০৫ হা. ৩০০৮৩, সুনানে নাসাঈ ২/৩১০ হা. ৫৪২৮, তাফসীরে দুররে মনসূর ১/৩৬৫)

হাদীসের মূল ইবারত মুসলিম শরীফের।

হাদীসটির মান : সহীহ।

হাদীস নং ১০ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ :أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে সমস্ত লোক আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তখন আসমান হতে এক ফেরেশতা ঘোষণা করে যে, তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের গোনাহসমূহকে নেকী দ্বারা বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(মুসনাদে আহমদ ৩/১৪২ হা. ১২৪৬২, মুসনাদে বাযযার [কাশফুল আসতার] হা. ৩০৬১, মুসনাদে আবু ইয়ালা ৪/১৬১ হা. ৩১২৭, মুজামুল আওসাত ২/১৭১ হা. ১৫৭৯, মু'জামুল কাবীর ৬/২১২ হা. ৬০৩৯)

হাদীসের মূল ইবারত মুসনাদে আহমদের।

হাদীসটি মান : হাসান (আততারগীব ২/২৬৩)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ، إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আরেক হাদীসে এসেছে, (এর বিপরীতে) যে মজলিসে আল্লাহ তা'আলার কোনো যিকির হয় না, সেই মজলিস কেয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হবে।

(মুসনাদে আহমদ ২/৪৫৩, সহীহ ইবনে হিব্বান [আল ইহসান] ২/৩৫২ হা. ৫৯২, শু'আবুল ঈমান ১/৪০১ হা. ৫৩৩, ৫৩৪, তাফসীরে দুররে মানসূর ১/৩৬৫)

হাদীসের মূল ইবারতটি শু'আবুল ঈমানের।

হাদীসটির মান : সহীহ। (আততারগীব ২/২৬৩, হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)

ক. এক হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহ তা'আলার যিকির হয় না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর ওপর দরূদ পড়া হয় না, সে মজলিসের লোক এমন যেন তারা মৃত গাধা ভক্ষণ করে ফারগে হলো।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ فِيهِ، إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً

(আবু দাউদ ২/৬৬৬ হা. ৪৮৫৫, মুসনাদে আহমদ ২/৩৮৯ হা. ৯০৭৫, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯২ হা. ১৮০৮)

হাদীসটি মান : সহীহ। (আল মাওসুআতুল হাদীসিয়্যাহ ১৫/২১)

খ. এক হাদীসে এসেছে, মজলিসের কাফফারা অর্থাৎ মজলিসের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য মজলিসের শেষে এই দু'আ পড়ে নেবে।

سُبْحَانَ الله، وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مَنْ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ، وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَ كَالطَّابَعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ، كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ

(আবু দাউদ ২/৬৬৬ হা. ৪৮৫৮, তিরমিযী ২/১৮১ হা. ৩৪৩৩, নাসাঈ [কুবরা] ৬/১১২ হা. ১০২৫৭, মু'জামুল কাবীর ২/১৩৯ হা. ১৫৮৭, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৩৭ হা. ১৯৭০, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলি ১৪২ হা. ৪৩৩)

হাদীসটির মান : সহীহ। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৪৩৩)

গ. আরেক হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহ তা'আলার যিকির হয় না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পড়া হয় না, সে মজলিস কিয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আপন দয়ায় চাইলে ক্ষমা করে দেবেন অথবা শাস্তি প্রদান করবেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ

(তিরমিযী ২/১৭৫ হা. ৩৩৮০, সুনানুল কুবরা ৩/২১৭ হা. ৫৭৭২, মুসনাদে আহমদ ২/৪৮৪ হা. ২০২৮৬)

হাদীসটির ইবারত তিরমিযীর।

হাদীসটির মান : সহীহ। (তিরমিযী ২/১৭৫)

ঘ. এক হাদীসে আছে, তোমরা মজলিসের হক আদায় করো। আর তা এই যে, বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো। পথিককে প্রয়োজনে পথ দেখিয়ে দাও। নাজায়েয কিছু সামনে এলে চক্ষু বন্ধ করে লও।

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ :قَالَ أَهْلُ الْعَالِيَةِ :يَا رَسُولَ اللهِ، لَا بُدَّ لَنَا مِنْ مَجَالِسَ، قَالَ :فَأَدُّوا حَقَّ الْمَجَالِسِ ، قَالُوا : وَمَا حَقُّ الْمَجَالِسِ؟، قَالَ :ذِكْرُ اللهِ كَثِيرًا، وَأَرْشِدُوا السَّبِيلَ، وَغُضُّوا الْأَبْصَارَ

(আল মু'জামুল কাবীর ৬/৮৭ হা. ৫৫৭২, জামেউস সগীর ১/৮০ হা. ৩২৭)

হাদীসটির ইবারত মু'জামুল কাবীরের।

হাদীসটির মান : হাসান। (জামেউস সগীর ১/৮০)

ঙ. হযরত আলী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে, তার সাওয়াব অনেক বড় পাল্লায় ওজন করা হউক। (অর্থাৎ তার সাওয়াব বেশি হোক) সে যেন মজলিসের শেষে এই দু'আ পাঠ করে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قَالَ عَلِيٌّ " :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى فَلْيَقُلْ عِنْدَ فَرُوغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ :(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الصافات ١٨١)

(কানযুল উম্মাল ২/১৩৫ হা. ৩৪৮১, তাবারানী [কাবীর] ৫/২১১ হা. ৫৫১২৪, মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/১০৩ হা. ১৬৯২৬, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১/২৫৮ হা. ৩১৯৬)

হাদীসটির মান : হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

চ. পাহাড় স্থানান্তরিত হয় কিন্তু স্বভাব বদলায় না। এই প্রবাদটিও একটি হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, তোমরা যদি শুনতে পাও যে, পাহাড় নিজের জায়গা হতে সরে অন্যত্র চলে গিয়েছে তবে তা বিশ্বাস করতে পারো; কিন্তু যদি শুনতে পাও যে, কারো স্বভাব বদলে গিয়েছে, তবে তা বিশ্বাস করো না।

أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكَرُ مَا يَكُونُ، إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ، فَصَدِّقُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ، فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ ، وَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ

(মুসনাদে আহমদ ৬/৪৪৩ হা. ২৭৫৬৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১৯৬ হা. ১১৮২৭)

হাদীসটির মান : হাসান। (অন্য সাহাবী থেকেও হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে)

ছ. হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি ওই ব্যক্তিকে চিনি, যাকে সকলের শেষে জাহান্নাম হতে বের করা হবে এবং সকলের শেষে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, তার বড় বড় গোনাহ যেন এখন উল্লেখ করা না হয়; বরং ছোট গোনাহগুলোকে তার সামনে পেশ করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অতঃপর হিসাব শুরু হয়ে যাবে–একেকটি গোনাহ সময় উল্লেখ করে তার সামনে পেশ করা হবে। সে উপায় না দেখে এগুলো স্বীকার করতে থাকবে। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইরশাদ করা হবে, তার প্রতিটি গোনাহের বদলে এক একটি নেকী দান করো। তখন সে তাড়াতাড়ি বলে উঠবে, হে আল্লাহ! এখনো অনেক গোনাহ বাকি রয়েছে যেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেসে উঠলেন।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ :اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ :عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ :نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ :فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ، قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا "فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ،

(সহীহ মুসলিম ১/১৭৭ হা. ৪৬৪, সুনানে তিরমিযী ২/৮৭ হা. ২৫৯৭, মুসনাদে আহমদ ৫/১৭০ হা. ২১৫৪৮, সহীহ ইবনে হিব্বান [আল ইহসান] ১৬/৩৭৫)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং ১১ :

عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহর যিকির হতে বড় মানুষের আর কোনো আমল কবরের আযাব হতে অধিক নাজাত দানকারী নেই।

(মুসনাদে আহমদ ৫/২৩৯ হা. ২২১৪০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৩ হা. ১৬৭৪৫, জামেউস সাগীর ৪/১৫৭৬ হা. ৭৯৪৭, আল মু'জামুল কাবীর ২০/১৬৭ হা. ৩৫২, মেশকাতুল মাসাবীহ ২/৭০৫ হা. ২২৮৪, মুআত্তা মালেক ১/২১১ হা. ২৫, তিরমিযী ২/১৭৫ হা. ৩৩৭৭, ইবনে মাজাহ ২/২৬৮ হা. ৩৭৯০, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯৬ হা. ১৮২৫)

হাদীসটির মান : সহীহ। (জামেউস সাগীর ৪/১৫৭৬ ও মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯৬)

ক. হযরত উসমান (রা.) যখন কবরের পাশ দিয়ে যেতেন তখন তিনি এত কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে যেত। কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় এত কাঁদেন না, কবরের সামনে এলে যত কাঁদেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, কবর আখিরাতের মঞ্জিলসমূহের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। যে ব্যক্তি তা হতে নাজাত

পেয়ে যায় তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিল সহজ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি তা হতে নাজাত পায় না তার জন্য পরবর্তী সব মঞ্জিল কঠিন হতে থাকে। অতঃপর হযরত উসমান (রা.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র ইরশাদ শোনালেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি কবরের দৃশ্য হতে বেশি ভয়াবহ কোনো দৃশ্য দেখিনি।

عَنْ هَانِئٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ :كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ :تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَا تَبْكِى، وَتَبْكِى مِنْ هَذَا؟ قَالَ :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ :وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

(সুনানে তিরমিযী ২/৫৭ হা. ৩২০৮, সুনানে ইবনে মাজাহ ২/৩১৫ হা. ৪২৬৭)

মূল ইবারত সুনানে ইবনে মাজাহ থেকে চয়নকৃত।

হাদীসটির মান : হাসান। (তিরমিযী শরীয় ২/৫৭)

খ. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক নামাযের পর কবরের আযাব হতে পানাহ চাইতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا :أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ :نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زاد غندر عذاب القبر حق۔

(সহীহ বুখারী ১/১৮৩ হা. ১৩৭২, সহীহ মুসলিম ১/২১৭ হা. ১৩২১, সুনানে নাসাঈ ১/১৯৩ হা. ১৩০৯)

হাদীসের ইবারত বুখারী থেকে চয়নকৃত।

হাদীসটি মুত্তাফাক আলাইহি।

গ. হযরত যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আমার এই আশংকা হয় যে, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে কবরে দাফন করা ছেড়ে দেবে, তা না হলে আমি দু'আ করতাম যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনিয়ে দেন।

وَلَكِنْ حَدَّثَنِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ :بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ -قَالَ :كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ -فَقَالَ :مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ :أَنَا، قَالَ :فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ "قَالَ :مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ :إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِى قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

(সহীহ মুসলিম ২/৩৮৬ হা. ৭২১৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/৩৭৩ হা. ১২১৫৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

ঘ. এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো এক সফরে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর উটনী লাফাতে আরম্ভ করল। কেউ জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উটনীর কী হলো? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তির কবরে আযাব চলছে, এর আওয়াজ শুনে লাফাতে আরম্ভ করেছে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَنَفَرَتْ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ رَاحِلَتِكَ نَفَرَتْ؟ قَالَ :إِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ، فَنَفَرَتْ لِذَلِكَ

(আল মু'জামুল আওসাত ৪/৪৭ হা. ৩৩৬৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৫৬ হা. ৪২৯০)

হাদীসের ইবারত মু'জামুল আওসাত থেকে চয়নকৃত।

হাদীসের মান : হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ঙ. একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে গিয়ে দেখলেন, কিছু লোক খিল খিল করে হাসছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তোমরা যদি মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে তবে এই অবস্থা হতো না। এমন কোনো দিন যায়

না যেদিন কবর এই কথা ঘোষণা করে না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি নির্জনতার ঘর, আমি কীটপতঙ্গের ও জীবজন্তুর ঘর। যখন কোনো কামেল মুমিনকে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন মোবারক হোক, তুমি খুবই ভালো করেছ যে, আগমন করেছ। যত মানুষ আমার পিঠের ওপর (অর্থাৎ জমিনের ওপর) দিয়ে চলত তুমি তাদের মধ্যে আমার নিকট খুবই প্রিয় ছিলে। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হয়েছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখতে পাবে। অতঃপর কবর এত প্রশস্ত হয়ে যায় যে, দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত খুলে যায়। তাতে জান্নাতের একটি দরজা খুলে যায়, যার দ্বারা জান্নাতের হাওয়া ও খোশবু আসতে থাকে। আর যখন কাফের অথবা বদকার লোককে দাফন করা হয়, তখন কবর বলে, তোর আগমন অশুভ ও না মোবারক। কী প্রয়োজন ছিল তোর আসার। যত মানুষ আমার পিঠের ওপর চলত তাদের মধ্যে তুই আমার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ছিলি। আজ তোকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। তুই আমার আচরণ দেখতে পাবি। এ কথা বলে কবর তাকে এত জোরে চাপ দেয় যে, তার এক পার্শ্বের পাঁজরের হাড় অন্য পার্শ্বের পাঁজরের হাড়ের ভেতর এমনভাবে ঢুকিয়া যায়; যেমন এক হাত অপর হাতের মধ্যে ঢোকালে দুই হাতের অঙ্গুলি পরস্পরের ভেতর ঢুকে যায়। অতঃপর নব্বই নিরানব্বইটি অজগর সাপ তার ওপর নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। যারা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ওই অজগরগুলোর একটিও যদি জমিনের ওপর ফুৎকার মারে তবে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের বুকে কোনো ঘাস জন্মাবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কবর জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ :دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلاَّهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ :أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى، فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلاَّ تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ :أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ، وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ، وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ :مَرْحَبًا وَأَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَحَبَّ مَنْ يَمْشِى عَلَى ظَهْرِى إِلَىَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيعِى بِكَ قَالَ :فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ .وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ :لاَ مَرْحَبًا وَلاَ أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِى عَلَى ظَهْرِى إِلَىَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيعِى بِكَ قَالَ :فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِىَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بِأَصَابِعِهِ، فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِى جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ :وَيُقَيِّضُ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِّينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

وفى رواية سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِى قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ,وَلَوْ أَنَّ تِنِّينًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاءَ

(সুনানে তিরমিযী ২/৭২ হা. ২৪৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৩/১৭৫ হা. ৩৫৩২৭, মুসনাদে আহমদ ৩/৩৮ হা. ১১৩৪০, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ হা. ৯২৯, মুসনাদে আবী ইয়ালা ২/১১২ হা. ১৩২৪, ইবনে হিব্বান [আল ইহসান] ৭/৩৯১ হা. ৩১২১)

হাদীসটির ইবারত সুনানে তিরমিযী ও মুসান্নাফে আবী শায়বা থেকে চয়নকৃত।

হাদীসটির মান : হাসান। (হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত)

চ. এক হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ইরশাদ করলেন, 'এই দুজনের আযাব হচ্ছে। একজনের চোগলখোরীর কারণে আর অপরজনের প্রস্রাবের ব্যাপারে অসাবধানতার কারণে।'

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ " :إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَقَالَ :لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

(সহীহ বুখারী ১/৩৬ হা. ২১৬, সহীহ মুসলিম ১/১৪১ হা. ৬৭৭, সুনানে আবু দাউদ ১/৪ হা. ২০, সুনানে নাসাঈ ১/১২ হা. ৩১, সুনানে তিরমিযী ১/২০ হা. ৭০, সুনানে

ইবনে মাজাহ ১/২৯ হা. ৩৪৭)

হাদীসের ইবারত সুনানে আবু দাউদ থেকে চয়নকৃত।

হাদীসটির মান : সহীহ।

ছ. ইবনে হাজর মক্কী বলেন, সহীহ হাদীসে আছে, বেশির ভাগ কবরের আযাব প্রস্রাব হতে অপবিত্রতার কারণে হয়ে থাকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

(সুনানে ইবনে মাজাহ ১/১২৫ হা. ৩৪৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/১২২ হা. ১৩১৫, মুসতাদরাকে হাকেম ১/১৮৩ হা. ৬৫৩, মুসনাদে আহমদ ১৪/৭৬ হা. ৮৩৩১, সুনানো দারাকুতনী ১/২৩৩ হা.৪৬৫, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২৯৩ হা. ৬৫৩)

হাদীসের ইবারত সুনানে ইবনে মাজাহ থেকে চয়নকৃত।

হাদীসটির মান : সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম ১/১৮৩)

জ. এক হাদীসে আছে "কবরের মধ্যে সর্বপ্রথম পেশাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :اتَّقُوا الْبَوْلَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ

(আল মু'জামুল কাবীর ৮/১৫৭, হা. ৭৬০৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/২০৯ হা. ১০৩৪, আততারগীব ১/৮৬ হা. ২৬৮)

হাদীসের ইবারত মু'জামুল কবীর থেকে চয়নকৃত।

হাদীসটির মান : সহীহ। (আততারগীব ১/৮৬ ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/২০৯)

ঝ. যেমন হাদীস শরীফে আছে, প্রত্যেক রাত্রে সূরায়ে তাবারাকাল্লাযী পড়া কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে হেফাজত ও নাজাতের উপায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ " :مَنْ قَرَأَ (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ، وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ "مُخْتَصَرٌ.

(নাসাঈ [সুনানে কুবরা] ৯/২৬২ হা. ১০৪৭৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ وَهِيَ سُورَةُ تبارك "

(মুসনাদে আহমদ ২/২৯৯ হা. ৭৯৭৫, মুসনাদে আবদে ইবনে হুমাইদ ৪২১ হা. ১৪৪৫, সুনানে তিরমিযী ২/১১৬ হা. ২৮৯১, সুনানে আবী দাউদ ১/১৯৯ হা. ১৪০০, ইবনে মাজাহ ২/২৬৭ হা. ৩৭৮৫, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৬৫)

হাদীসটির মান : সহীহ (মুসতাদরাকে হাকেম)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

কামিয়াবীর রাস্তা

প্রত্যেক ছোট বস্তু তখনই সফলকাম হয়, যখন তার ওপর বড়দের সাহায্য থাকে। আলো ছড়ানোর কেন্দ্রবিন্দু হলো বিদ্যুৎকেন্দ্র। প্রত্যেক বিদ্যুৎকেন্দ্র তার ক্ষমতানুযায়ী আলো ছড়িয়ে থাকে। যদি বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, তথা লাইন কেটে যায় বা সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় তবে বাল্ব, পাখা ইত্যাদি সব বন্ধ হয়ে যাবে। কারখানা চলবে না। দোকানপাট, রাস্তাঘাট অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। পথঘাটে চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাইকারীর আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। এর কারণ হলো বড় তথা বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাহায্য বন্ধ হয়ে গেছে। যদি সংযোগ চালু থাকে তখন দেখবেন আলোতে পুরো দেশ ঝক ঝক করে থাকে। চতুর্দিকে শান্তির পরিবেশে মানুষ জীবন যাপন করছে। তেমনি আল্লাহর মদদ যখন জারি থাকে মানুষ স্থিতিশীলতা ও শান্তিতে জীবন যাপন করে। আল্লাহর মদদ না হলে মানুষ কিছুই করতে পারে না।

হরকতে বরকত

চলতে থাকলে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছা যায়। দেখুন গাড়ি চলতে চলতে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যায়। হরকতকারীর তাবে লোকও তার সাথে সাথে পৌঁছে যায়। যেমন ট্রেনের ইঞ্জিন চলতে থাকে। তার অনুগামী হয়ে ট্রেনের বগিগুলোও চলতে থাকে। ইঞ্জিন যেখানে পৌঁছে বগিগুলোও সেখানে পৌঁছে যায়। তেমনি যারা ভালো কাজ করে, নেক আমল করে, আমলে সালেহ করে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখলে, তাদের অনুসারী ও অনুগামী হলে অন্যদের কী অবস্থা হতে হবে? স্পষ্ট কথা হলো, তারাও আল্লাহ চাহে তো গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। সুতরাং নেক বান্দাদের অনুগামী ও অনুসারী হও। হাদীস শরীফে এসেছে–

المرأ مع من احب

মানুষের হাশর তার সাথে হবে, যাকে সে ভালোবাসত। (মিশকাত ২/৪২৬)

ওলী হওয়ার সংক্ষিপ্ত রাস্তা

কোনো গন্তব্যে পৌঁছতে যেমন কয়েকটি রাস্তা থাকে। কিছু থাকে কাছের, কিছু দূরের। তেমনি আল্লাহ তা'আলার ওলী হওয়ার জন্য সকল মুমিনের ইচ্ছা থাকে। ওলী হওয়ার জন্যও রাস্তা কয়েকটি আছে। একটি দূরের রাস্তা। তা হলো প্রত্যেক হুকুম আহকাম গুরুত্ব সহকারে পালন করা। সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে মুক্ত থাকা। সততার ওপর জীবন যাপন করা ইত্যাদি। আরেকটি রাস্তা খুব কাছের, তা হলো হজ এবং রামাজান শরীফ। হজ প্রত্যেকের ভাগ্যে জোটে না। কিন্তু রামাজানুল মোবারক সকলে প্রাপ্ত হয় এবং খুব সহজ। তবে ওই মাসের রোযাগুলো গুরুত্ব সহকারে রাখা এবং রামাজান মাসকে কাজে লাগানো।

যিকিরের গুরুত্ব এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা

রামাজান মাসে পালনীয় বিষয়াদির মধ্যে একটি হলো لا اله الا الله এর যিকির বেশি বেশি করা। এটি খুবই সহজ কাজ। প্রত্যেকের এটি স্মরণ আছে। সুতরাং এর পাবন্দি করা, উঠতে-বসতে যখনই স্মরণ হয়, তা পাঠ করতে থাকা। যখনই অবকাশ হয় আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব দেওয়া। উত্তম যিকির হলো অনুচ্চস্বরে করা, সেরূপ উত্তম দু'আ হলো অনুচ্চস্বরে করা। আরেকটি হলো ত্যাগ করার বিষয়, তা হলো গোনাহ-পাপকর্ম। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও একটি সার্বক্ষণিক কাজ। বিশেষভাবে রামাজান মাসে বেঁচে থাকা আবশ্যক। আরেকটি হলো কম কথা বলা। কম কথা বলাও সব সময়ের উত্তম বিষয়। কিন্তু বিশেষভাবে রামাজান মাসে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া খুবই জরুরি। কারণ অতিকথনের কারণে ইবাদতের নূর নষ্ট হয়ে যায়। ইনশাআল্লাহ এক মাস এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হলে আল্লাহর ওলী হওয়া খুব সহজ।

আধ্যাত্মিক শেফার জন্য মোবারক মাস

রামাজান মাসে তো শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। নফস একা হয়ে পড়ে। তখন রোযার মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করা যায়। তাই রূহানী শেফার জন্য রামাজান মাসকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

রোযা একটি বিশেষ ইবাদত

নামায যেমন দ্বীনের খুঁটি, যাকাত যেমন ইসলামের একটি স্তম্ভ; তেমনি রোযাও একটি স্তম্ভ। রোযা একটি বিশেষ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদত তো দেখা যায়। যেমন যাকাত আদায় দৃশ্যমান বিষয়। হজ করার সময় ইহরাম বাঁধলে বোঝা যায় হজ করা হচ্ছে। নামায আদায়কারীকেও দেখলে বোঝা যায় তিনি নামায আদায় করছেন। কিন্তু রোযা দেখা যায় না। কেউ রোযা না রেখে যদি বলে আমি রোযা রেখেছি। তখন তাকে মিথ্যুক প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। তাই রোযা এমন একটি বিশেষ ইবাদত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। বরং রোযাদার ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝে এই বিষয়ের কারো জানাশোনা থাকে না। তাই অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বিভিন্ন পরিসরে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বয়ান থেকে সংগৃহীত

জাতীয় সংকট : সমাধান কোন পথে

মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন যে মহান আল্লাহ জীবন পরিচালনার পথ ও পন্থাও বাতলে দিয়েছেন তিনিই। মানুষের জীবন সব সময় এক অবস্থায় থাকে না। উতরাই-চড়াই আর ঘাত-প্রতিঘাত ডিঙিয়ে চলে মানব জীবন। তাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের কোনো মোড়ে গিয়ে সংকট বা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হওয়া অতি সাধারণ একটি বিষয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি কেন আসে এবং তা থেকে উত্তরণের পথ কী তার বিবরণ রয়েছে পবিত্র কোরআন-হাদীসে। কোনো জাতির কাছে কোরআন থাকবে অথচ তারা সংকট নিরসনে হিমশিম খাবে, তা হতে পারে না। কোরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা মতে পথ চললে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে অচল অবস্থা, অস্থিরতা, অশান্তি আর নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে ওঠা একেবারে সহজ। মানব জীবনে যত বিপর্যয় আছে তা পবিত্র নিঃস্বার্থ ও কল্যাণময় এই দিকনির্দেশনা উপেক্ষার ফল। নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে সংকট নিরসনের পথ বের করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, কারণ মানুষের কর্তৃত্ব সীমিত এবং জ্ঞান স্বল্প। ভবিষ্যৎ তার কাছে অজানা এবং সাথে রয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ। তাই সৃষ্টির সংকট নিরসনে স্রষ্টার দেওয়া বিধিবিধান মানবের শিরোধার্য।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এই সহজ সত্য কথাটির দিকে বিপদগ্রস্তরা ভ্রূক্ষেপ করে কদাচিৎ। মনগড়া সব পন্থা সমাজে উঁকি মারে আর পক্ষ-বিপক্ষ যুক্তিতর্কের ঝড় বইতে থাকে। মিডিয়াগুলো সরব হয় বিভিন্ন পরামর্শ নিয়ে। দেশ-বিদেশের বুদ্ধিজীবীরা আওড়াতে থাকে নানা উপদেশ। কিন্তু একটিবার কেউ পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখে না।

বিপদ কেন আসে?

মানুষ বিপদগ্রস্ত হলে বা কোনো সংকটে পড়লে পরস্পর একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে, তা নিজের কৃতকর্মের ফল। তাই অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে নিজের আমলনামায় চোখ বোলানো দরকার। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।" (সূরা রুম-৪১)

মানুষের গোনাহের কারণে শুধু মানব জাতির মাঝেই বিপর্যয় সীমাবদ্ধ থাকে না বরং চতুষ্পদ জন্তু ও পশুপাখিরাও আক্রান্ত হয়। কারণ গোনাহের কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কেয়ামতের দিন এরা সবাই গোনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। (তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন)

বনী ইসরাঈলের আযাব

আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর দরুন যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিকে বহুমুখী আযাবে নিপতিত করা হয়েছে। যার বিবরণ পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান। তন্মধ্যে বনী ইসরাঈলের ঘটনার মাঝে রয়েছে কেয়ামত অবধি আগত সকল মানবের জন্য শিক্ষা। আল্লাহর নাফরমানীর কারণে বনী ইসরাঈলের ওপর দু-দুইবার জালেম বাদশাহ আক্রমণ চালিয়ে গণহত্যা ও লুণ্ঠন চালায়। ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তাদের জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। পবিত্র কোরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে তাদের ওই ঘটনা ব্যক্ত হয়েছে।

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (٥) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (٦) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (٧) عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (٨).

আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দুইবার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম

সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। অতঃপর আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম। তোমাদের ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। তোমরা যদি ভালো করো, তবে নিজেদেরই ভালো করবে এবং যদি মন্দ করো, তবে তাও নিজেদের জন্যই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয় সেখানে পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। হয়তো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ করো, আমিও পুনরায় তা-ই করব। (সূরা বনী ইসরাঈল ৪-৮)

তাফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হুযায়ফার (রা.) বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

"হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে আরজ করলাম, বায়তুল মুকাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বলেন, দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান ইবনে দাউদের (আ.) মাধ্যমে স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকূত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সুলায়মান (আ.) যখন এর নির্মাণকাজ আরম্ভ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিনদেরকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাফরমানী করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হলো এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতে নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতে নছর ছিল অগ্নি উপাসক। সে ৭০০ বছর বায়তুল মুকাদ্দাস শাসন করে। কোরআনে পাকে–

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيد

উক্ত আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। বুখতে নছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দি করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার উট/গাধার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী ইসরাঈলকে ১০০ বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবিলার জন্য তৈরি করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে বুখতে নছরের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দেন।

বুখতে নছর যেসব ধনসম্পদ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানি বাদশাহ সেগুলোও বায়তুল মুকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী করো এবং গোনাহের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দিত্বের আযাব তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দি করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার উট/গাধার গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধনসম্পদ রোমের স্বর্ণমন্দিরে এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যমানায় হযরত মাহদী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্র করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)

উল্লিখিত ঘটনাবলির সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ছিল এই, তারা যত দিন পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করবে, তত দিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে,

তখনই লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের ওপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না, বরং তাদের পরম প্রিয় কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফের শত্রু বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশ বিশেষ। কোরআনে পাক তাদের দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মুসা (আ.)-এর শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা (আ.)-এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনার জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের ওপর এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের ওপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এং বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশ, ধনসম্পদ এবং জনবল ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ ঘটনা

বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ, বনী ইসরাঈলের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যত : এই যে, মুসলমানগণ এ খোদায়ী বিধি ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পর্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থসম্পদও আল্লাহর আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। যাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে। (তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন)

খোদায়ী শাস্তির তিনটি প্রকার

আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যেকোনো শাস্তি দেওয়া তার পক্ষে সহজ। কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার শাসনকর্তাদের মতো পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দরকার হয় না এবং কোনো সাহায্যকারীও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি ওপর দিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোনো শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এককে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন। (সূরা আল-আনআম-৬৫)

এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, (১) যা ওপর দিক থেকে আসে। (২) যা নিচের দিক থেকে আসে। (৩) যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। *عذابا* শব্দটিতে *تنوين* সহ *نكره* উল্লেখ করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

তাফসীরবিদগণ বলেন, ওপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। যেমন নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ওপর প্লাবণাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। আ'দ জাতির ওপর ঝড়ঝাঞ্জা চড়াও হয়েছিল। লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ওপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলের ওপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আবরাহার হস্তি বাহিনী যখন মক্কার ওপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের ওপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভুসির মতো হয়ে যায়।

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নিচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি ওপরের আযাব বৃষ্টির আকারে এবং নিচের আযাব ভূতল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে পতিত হয়েছিল। ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারুনও স্বীয় ধনভাণ্ডারসহ এ আযাবে পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল।

জালিম শাহী, অবাধ্য প্রজা

হযরত আব্দুল ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদগণ বলেন, ওপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নিচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, নোকর ও অধীন কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কতিপয় উক্তি থেকেও উপরোক্ত তাফসীরের সমর্থন পাওয়া

যায়। মেশকাত শরীফে বর্ণিত রয়েছে–

كما تكونوا يؤمر عليكم

অর্থাৎ, তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভালো কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসকবর্গ তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা সৎ ও আল্লাহর বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু ও সুবিচারক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি اعمالكم عمالكم এর অর্থও তাই।

মেশকাতে উল্লিখিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আল্লাহ। আমাকে ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি সব বাদশাহরও প্রভু। সব অন্তর আমার করায়ত্ত। আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন বাদশাহ ও শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করেই দিই। পক্ষান্তরে আমার বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে তাদের প্রতি কঠোর করে দিই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্যাতন করে। তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করো না। বরং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করো। যাতে আমি তোমাদের সব কাজ ঠিক করে দিই।

এমনিভাবে আবু দাউদ ও নাসাঈতে হযরত আয়েয (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন। যাতে প্রশাসক কোনো ভুল করে ফেললে সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন কোনো প্রশাসক বা শাসনকর্তার জন্য অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ লোকদেরকে তার পরামর্শদাতা ও অধীন করে দেওয়া হয়।

এসব হাদীস ও আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত তাফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা ওপর দিককার আযাব এবং যেসব কষ্ট অধীন কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নিচের দিককার আযাব। এগুলো কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। বরং খোদায়ী আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহ.) বলেন, যখন আমি কোনো গোনাহ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহনের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেজাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার আবধ্যতা করতে থাকে।

দলাদলি একটি সাজা

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে– اويلبسكم شيعا

অর্থাৎ, তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে এবং এক দল অন্য দলের জন্য আযাব হয়ে যাবে।

এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন–

الا لا ترجعون بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

অর্থাৎ, তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে। (মাযহারী)

উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ শাস্তি

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত নামায পড়লাম। অনেকক্ষণ দু'আ করার পর তিনি বললেন, আমি পালনকর্তার কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি,

১. আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ তা'আলা এ দু'আ কবুল করেছেন।

২. আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ তা'আলা এ দু'আও কবুল করেছেন।

৩. আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত এরূপ দু'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (মাযহারী)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এতে তিনটি দু'আর মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের ওপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দেবেন না, যে সবাইকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দু'আ কবুল হয়েছে। অপর দু'আ এই যে, তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দু'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোনো ব্যাপক আযাব আগমণ করবে না, কিন্তু একটি আযাব দুনিয়াতে তাদের ওপরও আসতে থাকবে। এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এ জন্যই হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে

হুঁশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

সূরা হুদের এক আয়াতে এ বিষয় বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

অর্থাৎ, তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম। (সূরা হুদ ১১৯)

এতে বোঝা গেল যে, যারা পরস্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী।

এক আয়াতে বলা হয়েছে–

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না।

অন্য এক আয়াতে আছে–

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا

অর্থাৎ, যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না।

মুসিবতকে রাহাতে রূপান্তর

মানুষ যখন কোনো বিপদ, বিপর্যয় বা সংকটে পতিত হয় তখন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে ওই মুসিবতই তার রাহাতের কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে ভুল সিদ্ধান্ত তাকে ছোট বিপদ থেকে বড় বিপদে নিক্ষেপ করে, অস্থায়ী সংকট হয় দৃঢ় মজবুত। বিপর্যয় বয়ে আনে মহাবিপর্যয়।

বিপদাপদে আমরা শুধু বস্তুবাদী চেতনা নিয়ে বস্তুর দিকেই ধাবিত হই। মাখলুকের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা আর সমর্থন চাই। স্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ তাঁর অবাধ্যতাই প্রতিকূলতার মূল কারণ। বিপদাপদ দিয়ে তিনি অমনোযোগী বান্দাকে সতর্ক করতে চান, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এতে বাস্তবেই যদি বান্দা সতর্ক হয়ে সঠিক পথে ফিরে আসে তবে ওই মুসিবতই তার জন্য রাহাতে রূপান্তরিত হয়।

এ বিষয়বস্তুটি বোঝানোর জন্যই কোরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে। (সূরা সিজদা-২১)

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয়, বরং মেহেরবাণী ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ খোদায়ী গজব ও আযাবের আলামত। (তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন)

বিপদাপদের আসল প্রতিকার

মনে রাখতে হবে আযাব দেন যিনি পরিত্রাণও তাঁর কুদরতী হাতে রয়েছে। তাই বিপদ মুক্তির আশা ওই মহান ক্ষমতাধর অপার শক্তির মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছেই করতে হবে। তিনি একমাত্র পরিত্রাণদাতা। কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয়ে দু ফোঁটা অশ্রু ফেলে খাঁটি মনে তাওবা করলে তিনিই উদ্ধার করবেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٣) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٦٤)

আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহরণ করো যে, যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ-বিপদ থেকে। তথাপি তোমরা শিরক করো। (সূরা আল-আনআম ৬৩-৬৪)

বোঝা গেল, সকল বিপদাপদ, বিপর্যয় আর সংকটের আসল প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছেই দু'আ করা।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب

যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার দুঃশ্চিন্তা দূর করে দেবেন, সংকট উত্তরণের পথ দেখাবেন এবং অকল্পনীয় রিযিক দান করবেন। (বাইহাকী-৬৪২১)

তাওবার ধরন

ইসলামের যা কিছু বিধান রয়েছে, তা

মূলত দুই ভাগে বিভক্ত আক্বিদা-বিশ্বাস এবং আমল। তাওবা করে প্রথমে আক্বিদার ভুলভ্রান্তি শোধরাতে হবে। এরপর বিশুদ্ধ আক্বিদার ওপর আমল করে যেতে হবে। ছুটে যাওয়া আমলের তাওবা করে কাযা-কাফফারা দিয়ে আগামীতে পাবন্দী করতে হবে।

আক্বিদা সংশোধন

১. ইসলামের অন্যতম প্রধান আক্বিদা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক মনে করা। তিনিই রাজত্ব দান করেন বা ছিনিয়ে নেন। বৃক্ষের একটি পাতাও তাঁর হুকুম ছাড়া নড়ে না। এটা হচ্ছে মহা সত্য ও সহজবোধ্য একটি বিশ্বাস। এর বিপরীত যতসব তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করা শিরক। এসব থেকে তাওবা করা জরুরি।

২. ইসলামের আরেকটি মৌলিক আক্বিদা হচ্ছে, মালিকানা স্বত্বসংক্রান্ত। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা মতে নভোমণ্ডল আর ভূমণ্ডলের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ। বান্দার মালিকানা শুধু তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে তাঁর দেওয়া বিধান মতে আয়-ব্যয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ। হারাম-হালাল বিচার ছাড়া স্বাধীন ও মুক্তভাবে সম্পদ উপার্জন বা খরচের অধিকার মানুষের নেই। এটা একটি ইনসাফপূর্ণ ও বিশুদ্ধ আক্বিদা।

এর বিপরীত ব্যক্তিকে সম্পদের একচ্ছত্র মালিক বিশ্বাস করে স্বাধীনভাবে সম্পদের পাহাড় গড়া আর সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার দর্শন একটি ভ্রান্তনীতি। যেখানে হারাম-হালালের কোনো ভেদাভেদ নেই। জুলুম-ইনসাফের কোনো প্রশ্ন নেই। আছে শুধু সম্পদ উপার্জন আর ভোগের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। পশ্চিমা পুঁজিপতিদের শেখানো এই 'জুলুম' তাওবা করে বর্জন করতে পারলে তবেই শান্তির আশা করা যায়। ব্যক্তিজীবন থেকে জাতীয় জীবনের সংকট আর বিপর্যয় কেবল তখনই দূর হতে পারে। সমাজের উঁচু-নিচু সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। অন্যথায় দিন যত যাবে, সংকট আরো প্রকট হবে। বিপর্যয় ধেয়ে আসবে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায়। ছোট আযাব নিক্ষেপ করবে আযাবের অতল গহ্বরে। তাই আসুন তাওবা করে প্রত্যেকেই নিজের আক্বিদা বিশ্বাস আর আমলকে সংশোধন করে নিই। তাহলে অচিরেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ আর দেশের মাঝে রহমতের সুবাতাস বইতে থাকবে।

সংকলন ও গ্রন্থনা
মুফতী শরীফুল আজম

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta RoadHatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424, Mobile: 01675303592, 01711527232

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 0980/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039, Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

ইসলামে ছবি ভিডিও ও ভাস্কর্য নির্মাণের বিধান

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

আল্লাহ তা'আলার নিকট মনোনীত ধর্ম ও একমাত্র শান্তিময় ধর্ম হলো ইসলাম ধর্ম, যাতে নেই কোনো ধরনের সঙ্কীর্ণতা ও লাগামহীন স্বাধীনতা এবং নেই এমন কোনো আদেশ, যা পালন করা দুষ্কর এবং নেই এমন কোনো নিষেধ, যা বর্জন করা অসম্ভব। বরং তাতে রয়েছে সহজতা ও পূর্ণতা এবং ব্যাপকতা ও কোমলতা।

কিন্তু এই ধর্মের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতার দরুন মুসলিমদের মাঝে ইহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক ও বিভিন্ন অমুসলিমদের সীমাহীন অপসংস্কৃতি ও অসভ্যতা অনুপ্রবেশ করেছে, যার অন্যতম হলো প্রাণীর ছবি আঁকা ও তোলা এবং ভাস্কর্য ও মূর্তি নির্মাণ করা। তাই এ বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সংক্ষেপে কিছু বিধিনিষেধ উল্লেখ করা হলো।

প্রাণীর ছবি আঁকা বিনা ঠেকায় ছবি তোলা সংরক্ষণ করা ও প্রদর্শন করার বিধান

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন প্রাণীর ছবি অংকনকারীরা সবচেয়ে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৫৯৫০, সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২১০৯) তেমনি হযরত আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ঘরে কুকুর কিংবা প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। (সহীহ বুখারী শরীফ হা. নং ৫৯৪৯, সহীহ মুসলীম শরীফ হা. নং ২১০৬) অন্য হাদীসে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, যে কেউ দুনিয়াতে কোনো প্রতিকৃতি তৈরি করবে তাকে কিয়ামতের দিন বাধ্য করা হবে যেন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে, অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না। (সহীহ বুখারী হা. নং ৫৯৬৩, সহীহ মুসলিম হা. নং ২১১০) ঠিক তেমনি হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ঘরে অঙ্কিত কিছু দেখলে তা বিনষ্ট করে দিতেন। (বুখারী হা. নং ৫৯৬২)

এ ছাড়া আরো অনেক হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের আছার, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন ও ফুকাহা কেরামের কথা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা বিনা ঠেকায় ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করা বা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। ঠিক তেমনি কোনো ব্যক্তির ছবি, চাই সেটা কোনো আলেম বা বুযুর্গের ছবি হোক না কেন; নিজের সাথে বা ঘরে বরকত বা সৌন্দর্য কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা বা ঝুলিয়ে রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয তথা হারাম বরং শাস্তি ও অভিশাপযোগ্য কাজ। (সহীহ বুখারী হা. নং ৫৯৫১, ৫৯৫৩, ৫৯৫৪, ৫৯৫৫, ৫৯৬০, ৫৯৬২, ৫৯৬৪, ২২২৫, ১৩৪১ সহীহ মুসলিম হা. নং ৯৬৯, ৫২৮, ২১১১, ২১১২, ২১০৭, নাসাঈ হা. নং ৫৩৬৫, সহীহ ইবনে হিব্বান হা. নং ৫৮৫৩ মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হা. নং ১৯৪৯২, ১৯৪৮৬, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা. নং ২৫৭০৬, ৩৪৫৩৮ শরহুননববী খ. ২, পৃ. ১৯৯ ফাতহুল বারী খ. ১০ পৃ. ৪৭০ উমদাতুল কারী খ. ১৫ পৃ. ১২৪ ফাতাওয়ায়ে আলম গীরী-৫/৩৫৯ ইমদাদুল মুফতীন পৃ. ৮২৯)

ক্যামেরায় ছবি বা ফটোগ্রাফির হুকুম

পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল যে ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করা বা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ হারাম, আর ক্যামেরায় ছবি যাকে আজকাল ফটোগ্রাফিও বলা হয় এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া এই যে যন্ত্রের পরিবর্তনের কারণে ফটোগ্রাফি এবং হাতে অঙ্কিত ছবির হুকুমে কোনো পার্থক্য ধরা হবে না। বরং ক্যামেরার ছবি, ফটোগ্রাফিও প্রকৃত ছবির প্রকারসমূহের মধ্যে এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হাতের দ্বারা ছবি অংকনের ন্যায় সম্পূর্ণ হারাম হবে।

(তাসবীর কী শরয়ী আহকাম পৃ. ৬০, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম খ. ৪ পৃ. ১৬৩)

ফটোগ্রাফির ছবি এবং ডিজিটাল ক্যামেরায় বা মোবাইলের ছবির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে ছবি উঠানোর যে এক অত্যাধুনিক পদ্ধতি তথা ডিজিটাল ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে যে ছবি তোলা হয় যদি তা স্ক্রিনে ধারণ করে সংরক্ষণ করা হয় চাই কাগজে বা অন্য কিছুর ওপর তার প্রিন্ট দেওয়া হোক বা না হোক, সেটা মূলত ছবিই এবং এতে ছবির সকল উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় পুরা হয়। সুতরাং আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে ডিজিটাল ক্যামেরা বা মোবাইলের ছবির পদ্ধতি যেমনই হোক না কেন, তা প্রকৃত ছবি বলেই গণ্য হয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনা অনুযায়ী হারাম হবে। কোনো কোনো আলেম এটাকে জায়েয বলতে চেয়েছেন কারণ বাহ্যিকভাবে এটা ছবি মনে হয় না। কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা ছবিই। কাজেই একে জায়েয বলার কোনো অবকাশ নেই। (বুখারী হা. নং ৫৯৫০, উমদাতুল কারী ১৫/১২৪, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১/৩৫০, আহাম

মাসাইল জিনমে ইবতেলায়ে আম খ. ১ পৃ. ২০৩, ২০১, ২/২৬২)

হাফ ছবি বানানোর বিধান

শুধু চেহারা বা মাথাসহকারে ওপরের অর্ধাংশের ছবি বিনা প্রয়োজনে আঁকা কিংবা তোলা নাজায়েয ও হারাম। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, মাথার প্রতিকৃতির নাম হলো ছবি, আর যাতে মাথা নেই, তা ছবি নয়। (শরহু মা'আনিল আছার, খ. ২ পৃ. ৩৩৯ নাসাঈ হা. ৫৩৬৫ সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ৫৮৫৩ শরহুস সিয়ারিল কাবীর, সারাখছী খ. ৪ পৃ. ২১৯ ফাতহুল বারী খ. ১০ পৃ. ৪৭০

প্রয়োজনের সময় ছবি তোলার বিধান

পূর্বোল্লিখিত আলোচনার দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে বিনা প্রয়োজনে কোনো প্রাণীর ছবি উঠানো সম্পূর্ণ হারাম; চাই সেটা ফুল ছবি হোক কিংবা হাফ ছবি হোক। তবে বিশেষ কোনো প্রয়োজনের কথা ভিন্ন, যেমন : শরয়ী কোনো জরুরত বা জীবনোপকরণের নেহায়েত প্রয়োজনে বহির্বিশ্বে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বা হজ-উমরার উদ্দেশ্যে, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে পাসপোর্টের জন্য কিংবা ভিসার জন্য কিংবা ন্যাশনাল পরিচয়পত্র সংগ্রহের জন্য ছবি তোলা বা এমন বিশেষ কোনো মুহূর্তে ছবি উঠানো, যেখানে মানুষের মুখমণ্ডল শনাক্ত করা আবশ্যকীয় হয়–এ ধরনের একান্ত প্রয়োজনে ছবি তোলার অবকাশ আছে। কেননা ফুকাহায়ে কিরাম একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার বিধানটি শিথিলভাবে বিবেচনা করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা হা. ২৭১৭ শরহুস সিয়ারিল কাবীর খ. ৪ পৃ. ২১৮ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, তাকি উসমানী ৪/১৬৪)

যে সমস্ত ছবির ব্যবহার বৈধ

এ ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের বস্তু রয়েছে

১. জড় বস্তু-বৃক্ষলতা, নদী-সাগর, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি প্রাণহীন বস্তু, তার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা বা তার ব্যবহার কিংবা ঘরে বা অন্য কোথাও লটকিয়ে রাখা বৈধ। যদি তাতে শরীয়তের অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকে। (বুখারী হা. ২২২৫ শরহুস সিয়ারিল কাবীর ৪/২১৯ ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬৫০)

২. বিচ্ছিন্ন কোনো অঙ্গ যেমন : হাত, পা, চোখ ইত্যাদি (তাসবীর কী শরয়ী আহকাম মুফতীয়ে আজম শফী (রহ.) কর্তৃক ৭৮)

৩. কোনো জানদারের ছবি যদি এত ছোট হয় যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পরিপূর্ণ বোঝা যায় না এবং তা যদি মাটিতে রাখা হয় আর একজন মধ্যম জ্যোতিশীল ব্যক্তি সোজা দাঁড়িয়ে উক্ত ছবির অঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে দেখতে না পায় (যেমন বিভিন্ন ক্যালেন্ডারে কাবা শরীফের যে ছবি থাকে) তাহলে এমন ছবি ব্যবহার করা বা ঘরে রাখা জায়েয। যদিও তা বানানো নাজায়েয।

(ফাতাওয়ায়ে শামী খ. ১ পৃ. ৬৪৯, তাছবীর কী শরয়ী আহকাম পৃ. ৮৩)

৪. ফটো যদি কোনো থলে, গিলাফ কিংবা কোনো ডিব্বা ইত্যাদির ভেতরে বন্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে উক্ত পাত্রসমূহ ঘরে রেখে ব্যবহার করা জায়েয, যদিও তা বানানো ও তার ক্রয় নাজায়েয। (শামী ১/৬৪৯, তাসবীর কী শরয়ী আহকাম পৃ. ৮৭)

ছবি বানিয়ে বা ফটো তুলে তার মূল্য গ্রহণ করার বিধান

বিনা প্রয়োজনে কোনো প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করার পর প্রস্তুতকারীর জন্য যেমন তার মূল্য নেওয়া নাজায়েয, তেমনি ক্রয়কারীর জন্য তার মূল্য দেওয়াও নাজায়েয। এ জন্য স্টুডিও ইত্যাদিতে ছবি বানানোর কাজে চাকরি করাও নাজায়েয।

তবে চিত্রকর ছবি বানাতে যে রং ইত্যাদি ব্যয় করেছে, তার মূল্য দিয়ে দেবে। (শামী ১/৬৫১)

মূর্তি ও ভাস্কর্যের হুকুম

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রাণীর মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ, জায়েয হওয়ার কোনো সুরত নেই। হ্যাঁ রয়েছে শুধু ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা।

এ জন্যই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, পূজার মূর্তি দুই কারণে হারাম, এক. প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়ায়, দুই. পূজা করায়। আর সাধারণ ভাস্কর্য হারাম হওয়ার কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

ক. সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য তৈরি করা হারাম, এটা প্রাণীর প্রতিকৃতির কারণে নয়; বরং কোনো কোনো ভাস্কর্য নির্মাতা তার নির্মিত ভাস্কর্যের ব্যাপারে এতই মুগ্ধতার শিকার হয়ে যায় যে যেন ওই প্রস্তরমূর্তি এখনই জীবন্ত হয়ে উঠবে! এখনই তার মুখে বাক্যের স্ফূরণ ঘটবে! বলাবাহুল্য, এই মুগ্ধতা ও আচ্ছন্নতা এই অলীক বোধের শিকার করে দেয়, যেন সে মাটি দিয়ে একটি জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছে। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যারা এসব প্রতিকৃতি তথা ছবি প্রস্তুত করবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে জীবন দাও। (সহীহ বুখারী : ৫৯৫৯)

খ. আর যদি স্মরণ ও সম্মানের উদ্দেশ্যে বানানো হয়, তাহলে এটা যেমন প্রাণীর ছবি হওয়ার কারণে হারাম, তেমনি এ কারণেও যে, এভাবে কোনো ছবির সম্মান দেখানো এক ধরনের ইবাদত বলেই গণ্য হবে। আর শয়তান এভাবেই ধীরে ধীরে মুসলমানদেরকে শিরকে লিপ্ত করায় যেমনিভাবে শয়তান অতীত জাতিসমূহকে স্মারক ভাস্কর্য প্রস্তুত করার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত করিয়ে ছিল। কেননা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মাঝে এ ধরনের স্মারক ভাস্কর্য থেকেই পূজার মূর্তির সূচনা হয়ে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। (মাআরিফুল কুরআন ৮/৫৬৬)

গ. আর যেসব প্রাণহীন বস্তুর পূজা করা হয় সেগুলোর ভাস্কর্য তৈরি করাও হারাম এটা পূজার কারণে, যদিও তা প্রাণীর

ছবি নয়।

ঘ. আরো দেখা যায় এই শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা ও প্রস্তুতকারীরা সীমারেখার পরোয়া করে না এবং নগ্ন ও অর্ধনগ্ন, নারী মূর্তি, মূর্তিপূজার বিভিন্ন চিত্র ও নিদর্শন ইত্যাদি বানিয়ে নিজেরা যেমন গোনাহগার হয়, তেমনি রাস্তার মোড়ে বা অলিতে-গলিতে স্থাপন করে অন্যদেরকেও গেনাহগার বানায়।

ঙ. তদুপরি এগুলো হচ্ছে অপচয় ও বিলাসিতার পরিচায়ক। বিলাসী লোকেরা বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত ছবিসমূহের মাধ্যমে তাদের অট্টালিকা ইত্যাদির সৌন্দর্যবর্ধন করে থাকে। ইসলামের সাথে এই অপচয় ও বিলাসিতার কোনো সম্পর্ক নেই।

এ জন্যই তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের সময় বাইতুল্লাহ ও তার চারপাশ থেকে সব ধরনের মূর্তি অপসারণ করেছিলেন এবং সকল মূর্তি ও ভাস্কর্য বিলুপ্ত করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কে সব ধরনের প্রতিকৃতি মিটিয়ে ফেলার আদেশ করেছিলেন, তারপর বিভিন্ন মধানে খোদিত ছবিগুলো সাহাবায়ে কেরাম (রা.) পানিতে কাপড় ভিজিয়ে ডলে ডলে সমান করার চেষ্টা করেছিলেন, এরপর অবশিষ্ট খোদিত চিত্র মাটির লেপ দিয়ে জাফরানের রং লাগানো হয়েছিল।(বুখারী হা. ২৪৭৮, ৪২৮৭, ৪৭২০, ৪২৮৮, মুসলিম হা.১৭৮১, আবু দাউদ হা. ২০২০, মুসান্নাফে ইবনে আবীশাইবা হা. ৩৮০৭৪, ইবনে হিব্বান হা. ৫৮৬১, ৫৮৫৭, সিরাতে ইবনে হিশাম ৪/৬৫, তারীখুল ইসালাম যাহাবী ১/৩৯৭-৩৯৮, শরহুননববী ২/১৯৯, উমদাতুলকারী ১৫/১২৪)

টিভি ও ভিডিওর শরয়ী হুকুম

টিভি ও ভিডিও রাখা, দেখা, দেখানো ও তাতে কোনো কিছু শোনা ও শোনানো নাজায়েয। কারণ, বর্তমানে নব উদ্ভাবিত এই জিনিস দুটির মাধ্যমে হারাম কার্যকলাপ সয়লাবের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন : বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, নোংরামী, প্রাণীর ছবি, বাজনা, খেল-তামাশা, নাচ-গান, বেগানা বেপর্দা মহিলাদের সাজগোজ করিয়ে অর্ধনগ্ন অবস্থা ও সতরহীন খেলোয়াড়দেরকে দর্শন করা প্রভৃতি। (তাকমিলাহ ৪/১৬৪, মুন্তাখাবে নিজামুল ফাতাওয়া ২/৩৬৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২৮৯)

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিডিও করা ও তা টিভির পর্দায় দেখা ও দেখানোর হুকুম

পূর্বোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে প্রাণীর ছবি তোলা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। আর ভিডিও করার সময় ছবি তুলতে হয় এবং তা পরবর্তীতে টিভির পর্দায় দেখার জন্য ফিল্মে সংক্ষরণ করে রাখতে হয়, যা প্রকৃতপক্ষে ছবিই, ছবির সকল উদ্দেশ্য এতে পূর্ণমাত্রায় পুরা হয়। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়া পেয়ে এটার পদ্ধতি যেমনই হোক না কেন, তা ছবি হিসাবেই বিবেচিত হবে এবং রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী অনুযায়ী হারাম তথা নাজায়েয হবে, আর যে জিনিস হারাম কাজ ছাড়া সম্ভব নয় বরং হারামের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয় তাও হারাম, চাই সেটা দুনিয়ার কাজের জন্য ব্যবহৃত হোক বা দ্বীনের কাজের জন্য ব্যবহৃত হোক–এ জন্যই তো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথাও হারাম কাজের মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে বলেননি। কারণ, হারাম কাজের মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য কখনও হতে পারে না, বরং তাতে দ্বীনের ক্ষতিই হয়। এ জন্যই শরীয়তে যে জিনিস করতে হলে হারাম কাজের সাহায্য নিতে হয় সেই জিনিসকে স্পষ্টভাবে হারাম হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

সুতরাং কোনো বড় আলেমের ওয়াজ-মাহফিল কিংবা হামদ-নাত, ইসলামী গজল কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক না কেন জানদার প্রাণীর ছবিসহকারে তা ভিডিও করা যেমন নাজায়েয, তেমনি তার ভিডিও টিভিতে বা অন্য কোথাও দেখা বা দেখানোও নাজায়েয। (বুখারী হা. ৫৯৫০, উমদাতুল কারী ১৫/১২৪, শামী ৯/১৯, জাদীদ ফিকহী মাসায়েল ১/৩৫০, হিদায়া ৪/৪৬৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩০২, আহাম মাসায়েল ২/২৬২)

ভালো কাজ ভিডিও করা ও তা টিভি ইত্যাদিতে দেখানো হারাম হওয়ার কিছু কারণ

১. প্রধান কারণ হলো তাতে ছবি তুলতে হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম।

২. ছবি দেখাও হারাম।

৩. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভিশপ্ত ব্যক্তি হওয়া।

৪. গোনাহের সবচেয়ে নিকৃষ্ট যন্ত্রসমূহের ব্যবহার করা।

৫. ভালো কাজের নামে দ্বীনের বে-হুরমতী করা।

৬. রহমতের ফেরেশতা থেকে দূরবর্তী হওয়া।

৭. এ ধরনের যন্ত্র কিনে অনর্থক মাল নষ্ট করা।

৮. আল্লাহ তা'আলার মহামূল্যবান নেয়ামত তথা সময়কে অহেতুক কাজে ব্যয় করা, যা মূল্যবান নেয়ামতের নাশুকরী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৯. হামদ-নাত ইত্যাদি ভালো কাজ ভিডিও দেখার দ্বারা ধীরে ধীরে খারাপ কাজের ভিডিও দেখার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

১০. কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া।

১১. ভালো কাজ ভিডিও করা ও তা টিভিতে দেখার দ্বারা গোনাহের কাজসমূহ ভিডিও করা ও তা টিভিতে দেখার ওপর দলিল হওয়া।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৫

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশের কারেন্সি নোটের হাতবদল

পূর্বের আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে যে, এক দেশের বিভিন্ন মুদ্রা ও কারেন্সি নোট সমজাতীয় এবং ভিন্ন দেশের মুদ্রা ভিন্নজাতীয়। কেননা বর্তমান সময়ে কারেন্সি নোট দ্বারা তার মূল উপাদান (Metarial) উদ্দেশ্য নয়। বরং আজকাল কারেন্সি নোট ক্রয় ক্ষমতার বিশেষ মানদণ্ডের (Standard) নাম। এবং প্রতিটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এ ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র মানদণ্ড নির্ধারণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে টাকা, সৌদি আরবে রিয়াল, আমেরিকায় ডলার ইত্যাদির পৃথক পৃথক মানদণ্ড রয়েছে। যা দেশের ভিন্নতার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেক দেশের মুদ্রার মান নির্ধারণ ওই দেশের আর্থিক সূচক (Index) ও তার আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদির ওপর হয়ে থাকে এবং এর মাঝে এমন কোনো বস্তুগত বিষয়ের সম্পৃক্ততা নেই, যা উক্ত মানদণ্ডের সাথে সংযুক্ত করা যায় এবং স্থায়ী কোনো অনুপাত ও সুষমতা (Proportion) রক্ষা করা যায়। বরং প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে উক্ত অনুপাতে প্রতিদিন বরং প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। মুদ্রার এই ভিন্নতার কারণে আমরা ওইগুলোকে সমজাতীয় বলতে পারি না বরং ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন জাতের। যতটুকু এক দেশের মুদ্রার সম্পর্ক এতে উপরোক্ত ভিন্নতা নেই। এক দেশের মুদ্রা পরিমাণের হিসাবে যদিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যথা দশ টাকার নোট এবং একশ' টাকার নোট। একশ' টাকার নোট এবং পাঁচশ' টাকার নোট। পাঁচশ' টাকার নোট এবং এক হাজার টাকার নোট পরিমাণ ও মূল্যমানে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে এমন এক স্থায়ী অনুপাত ও সুষমতা বিদ্যমান, যা কোনো অবস্থায় পরিবর্তন হয় না। অবস্থা যাই হোক উক্ত সুষমতা বহাল থাকে। যথা বাংলাদেশি দশ টাকার নোট সর্বদা ১০০ টাকার দশ ভাগের এক ভাগ এবং একশ' টাকার নোট সর্বদা পাঁচশ' টাকার নোটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এবং পাঁচশ টাকার নোট এক হাজার টাকার নোটের দুই ভাগের এক ভাগ ইত্যাদি। তাই উক্ত সুষমতা ও সমানুপাতের কারণে বাংলাদেশি মুদ্রা ও কারেন্সি নোট সমজাতীয়। উপরোক্ত সুষমতা ও সমানুপাত বাংলাদেশি মুদ্রা এবং সৌদি রিয়াল, অথবা সৌদি রিয়াল ও আমেরিকান ডলারের মধ্যে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এ কথা কখনো হলফ করে বলা যায় না যে, বাংলাদেশি টাকা ও সৌদি রিয়ালের মধ্যে সর্বাবস্থায় অমুক অনুপাত বহাল থাকে বা থাকবে তাই উভয় দেশের মুদ্রা ভিন্নজাতীয় হবে। যেহেতু ভিন্ন দেশের মুদ্রা ভিন্নজাতীয় এবং সমানুপাতিক থাকে না তাই উক্ত মুদ্রাগুলোর ক্রয়-বিক্রয় ইমাম চতুষ্টয়ের সর্বসম্মত মতানুসারে 'তাফাজুল' তথা অতিরিক্ততা ও আধিক্যের ভিত্তিতে বৈধ হবে এবং ভিন্নজাতীয় হওয়া ও বাঈ সরফ না হওয়ার দরুন এতে বাকিতে লেনদেনও বৈধ হবে।

হানাফী মাযহাব :

হানাফী মাযহাব মতে, এক পয়সার বিনিময়ে দুই পয়সার লেনদেন এ জন্য নাজায়েয ছিল যে পয়সা হলো সমপর্যায়ের। যার ফলে লেনদেনের সময় এক পয়সা এক পয়সার বিনিময়ে হলেও অপর পয়সা বিনিময়বিহীন রয়ে যায়। যা সুদ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের কারেন্সি ভিন্নজাতীয় হওয়ার কারণে সমপর্যায়ের নয়। তাই ওইগুলোর লেনদেনে কমবেশের সাথে লেনদেন করা হলে এর কোনো অংশকে বিনিময়বিহীন বলা যাবে না।

মালেকী মাযহাব

তাদের মতে, কারেন্সি যদিও সুদ সম্পর্কীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত, তবে ভিন্নজাতীয় হওয়ার কারণে এর লেনদেনে আধিক্য ও অতিরিক্ততা বৈধ।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব

তাদের মতে, এক দেশীয় মুদ্রার লেনদেনও অতিরিক্তসহ বৈধ। তাই ভিন্ন দেশের মুদ্রার লেনদেন তো অতিরিক্ততা ও আধিক্যসহ বৈধ না হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে এ ক্ষেত্রে জরুরি হলো–

(ক) আকদের (Contract) মজলিশে কমপক্ষে একপক্ষের কারেন্সির ওপর কবজ হতে হবে। যাতে 'বাঈউল কালী বিল কালী' অর্থাৎ বাকির বিনিময়ে বাকির লেনদেন না হয়, যা পবিত্র সুন্নাহর আলোকে অবৈধ।

(খ) বিক্রয়ের সময় বিক্রিতব্য কারেন্সি বিক্রেতার কবজায় থাকতে হবে, যাতে (بيع قبل القبض) কবজ করার পূর্বে বিক্রি করার নিষেধাজ্ঞার আওতায় না

পড়ে, যা পবিত্র সুন্নাহ দ্বারা অবৈধ। তাই যেসব মুদ্রা বাজারে (Money Market) মুদ্রার শুধুমাত্র রসিদের ভিত্তিতে বিক্রির ওপর বিক্রি হয়ে থাকে কেবল পার্থক্যটা সমান করে নেওয়া হয় এ ধরনের লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে উপরোক্ত শর্তের আলোকে অবৈধ।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রায় হুন্ডির বিধান

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা যেহেতু ভিন্নজাতীয় হওয়াটা সাব্যস্ত এবং এতে বাকির লেনদেন বৈধ। তাই এতে নিঃসন্দেহে হুন্ডি বৈধ হবে। উদাহরণস্বরূপ, বকর সৌদি আরবে আমরের নিকট এক হাজার রিয়াল বিক্রি করল এবং বলল তুমি এর পরিবর্তে আমার আব্বাকে বাংলাদেশে বিশ হাজার টাকা আদায় করবে। এটা বৈধ। তবে উক্ত মজলিশে রিয়ালের ওপর কবজ করা আমরের জন্য জরুরি হবে। কিন্তু দেশীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে যদি হুন্ডির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে তাহলে আইন লঙ্ঘনের অপরাধে আপরাধী হবে।

কিছু সংশয় নিরসন

(১) কিছু লোক দুই দেশের মুদ্রার লেনদেন আধিক্য ও বাকির ভিত্তিতে লেনদেন করাকে সুদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে অবৈধ বলেন। যথা, আজকের দিনের ডলারের মূল্য ৭৫ টাকা এবং এই হিসাবে বকর আমরকে পঞ্চাশ ডলার বাকিতে বিক্রি করল যার অর্থ দাঁড়ায় বকর আমরকে ৫০×৭৫=৩৭৫০ বাংলাদেশি টাকা দিল এবং আমর এক মাস পরে প্রতি ডলার ৭৭ টাকা হিসাবে বকরকে বাংলাদেশি টাকা আদায় করল। যার অর্থ দাঁড়ায় আমর বকরকে ৫০×৭৭=৩৮৫০ টাকা আদায় করল। যাতে একশ' টাকা বৃদ্ধি পেল, যা সুদ এবং অবৈধ।

কিন্তু উপরোক্ত প্রশ্ন তেমন শক্তিশালী নয় কারণ উক্ত পদ্ধতি বিশেষভাবে বাকির সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং তা নগদেও হতে পারে। বাস্তবতা হলো, ডলার এবং টাকা যখন ভিন্নজাতীয় হওয়াটা সাব্যস্ত সুতরাং এর লেনদেনে আধিক্য বৈধ। তা নগদ আকারে হোক বা বাকিতে এবং এটাকে সুদও বলা যাবে না।

(২) কিছু উলামায়ে কেরাম দুই ভিন্ন দেশের মুদ্রার লেনদেনকে বাঈসরফ সাব্যস্ত করে এর লেনদেনকে নাজায়েয বলেছেন এবং তাঁরা বলেন, এটা বাঈসরফ তাই এতে বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ করা জরুরি হবে। এবং এর লেনদেন বাকিতে বৈধ হবে না। যেমনটা المعايير الشرعية তে উল্লেখ রয়েছে–

تجوز المتاجرة فى العملات شريطة مراعاة الاحكام والضوابط الشرعية الآتية

ا- ان يتم التقابض قبل تفرق العاقدين سواء كان القبض حقيقيا ام حكميا

অর্থাৎ মুদ্রার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্ত ও শরয়ী নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যবসা ও লেনদেন বৈধ। ১. ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বেই বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ করা জরুরি হবে ওই কবজ যে ধরনের হোক না কেন?

تطور النقود ১৪৫ এর মধ্যে রয়েছে-

واذا اختلف الجنسان كأن يبيع الذهب بالفضة او بالعملات الورقية المختلفة وجب الحلول والتقابض وجاز التفاضل

অর্থাৎ বিনিময়দ্বয় যখন ভিন্নজাতীয় হবে যথা–স্বর্ণকে রৌপ্যের সাথে বিক্রি করা হবে অথবা ভিন্নজাতীয় কাগজে মুদ্রার লেনদেন হবে তখন এতে বিনিময়দ্বয় নগদ হওয়া এবং তাৎক্ষণিক কবজ করা জরুরি হবে। তবে একটা বিনিময়ের ওপর অপরটার আধিক্য বৈধ হবে।

এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বের আলোচনায় সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাঈসরফের জন্য জরুরি হলো বিনিময়দ্বয় প্রকৃতিগত ছমন হওয়া। যদি বিনিময়দ্বয় প্রথাগত ছমন হয় অথবা তন্মধ্যে একদিকে প্রকৃতিগত ছমন অপরটা প্রথাগত ছমন তাহলে ওই আকদকে বাঈসরফ বলা যাবে না এবং এতে বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ করা ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য জরুরি হবে না। উক্ত লেনদেন বাকিতেও বৈধ হবে। যদি বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে একদিকে প্রকৃতিগত ছমন অন্যদিকে প্রথাগত ছমন হয় তাহলে উক্ত আকদের মজলিশে একটা বিনিময়ের ওপর কবজ করা যথেষ্ট হবে উভয়টার ওপর কবজ করা জরুরি হবে না। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা ইসলামী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। যথা ফতহুল কাদীর গ্রন্থে রয়েছে যে,

وفى شرح الطحاوى لو اشترى مائة فلس بدرهم وقبض الفلوس او الدراهم ثم افترقا جاز البيع لانهما افترقا عن عين بدين (فتح القدير ٦/٢٧٨)

অর্থাৎ শরহে তাহাবীতে রয়েছে যে, যদি কেউ এক দিরহামের বিনিময়ে একশ' পয়সা ক্রয় করে এবং পয়সা অথবা দিরহাম যেকোনো একটার ওপর কবজ করে, অতঃপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। কেননা এতে ঋণের বিনিময়ে নগদ মুদ্রা ক্রয় করে উভয়ে পৃথক হয়েছে। এতে পয়সা হলো প্রথাগত ছমন এবং দিরহাম হলো প্রকৃতিগত ছমন উভয়টার হাতবদলের লেনদেন এতে একপক্ষের ওপর কবজ করাকে যথেষ্ট বলা হয়েছে।

আল্লামা শামী (রহ.) এ বিষয়ে তিনটা মতামত উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও বিশুদ্ধ মত হলো, এতে যেকোনো একপক্ষের ওপর কবজ করা যথেষ্ট। উভয় বিনিময়ের ওপর কবজ

করা জরুরি নয়।

فصار الحاصل ان مافى الاصل يفيد اشتراطه من احد الجانبين ومافى الجامع اشتراطه فيهما (رد المحتار ٣١٤/٧)

অর্থাৎ সারমর্ম হলো, কিতাবুল আসল, এর বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যেকোনো এক বিনিময়ের ওপর কবজ করা যথেষ্ট। এবং আল জামে' এর বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় বিনিময়দ্বয়ের ওপর কবজ করা জরুরি এবং ফাতাওয়া বাযযাযিয়া থেকে উদ্ধৃত করে বলেন–

سئل الحانوتى عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فاجاب بانه يجوز اذا قبض احد البدلين لما فى البزازية

অর্থাৎ আল্লামা হানূতী (রহ.) থেকে পয়সার বিনিময়ে বাকিতে স্বর্ণ ক্রয় করা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো, প্রতি উত্তরে তিনি বললেন এটা বৈধ। তবে শর্ত হলো, একটা বিনিময়ের ওপর কবজ পাওয়া যেতে হবে। কেননা ফাতাওয়া বাযযাযিয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি একশ' পয়সা এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে তাহলে একপক্ষ থেকে কবজ করা যথেষ্ট হবে। তিনি আরো বলেন, তদ্রূপ যদি পয়সার বিনিময়ে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য বিক্রি করে। আল্লামা সারাখসী (রহ.)-এর বক্তব্য দ্বারাও উপরোক্ত মতের প্রাধান্য বোঝা যায়। তিনি বলেন–

واذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لان الفلوس الرائجة ثمن كالنقود، وقد بينا ان حكم العقد فى الثمن وجوبها ووجودها معا ولا يشترط قيامها فى ملك بائعها لصحة العقد كما لا يشترط ذلك فى الدراهم والدنانير (المبسوط للسرخسى ٢٤/٤)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি দিরহামের বিনিময়ে পয়সা ক্রয় করে এবং ছমন অর্থাৎ দিরহাম নগদ আদায় করে এবং পয়সা বিক্রেতার নিকট নাও থাকে, তাহলেও উক্ত লেনদেন বৈধ। কেননা প্রচলিত পয়সা নুকুদের মতো (দিরহাম-দিনার) ছমন। আমরা এ কথা বর্ণনা করেছি যে, ছমনের মধ্যে আকদের হুকুম শুধুমাত্র তা ওয়াজিব হওয়া এবং অস্তিত্বসম্পন্ন হওয়া। ছমন আকদের সময় বিক্রেতার মালিকানায় থাকা আকদ সহীহ হওয়ার জন্য জরুরি নয়। দিরহাম-দিনারের ক্ষেত্রে যেমন এটা শর্ত নয় (পয়সার ক্ষেত্রেও হবে না)। বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে একদিকে প্রকৃতিগত ছমন হওয়া সত্ত্বেও যখন বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কব্জ করা শর্ত নয়। কোনো আকদের বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে একটিও যদি প্রকৃতিগত ছমন না থাকে বরং উভয়টা প্রথাগত ছমন তথা কাগুজে মুদ্রা হয় যথা বাংলাদেশি টাকা এবং আমেরিকান ডলার তাহলে এ ক্ষেত্রে তো বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ করা শর্ত হওয়ার প্রশ্নেই আসে না।

সরকারি রেটের তুলনায় কমবেশ করে কারেন্সি বিক্রি করা

বর্তমান সময়ে দৈনন্দিন মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করা যায় এবং যথারীতি মূল্য তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় সরকারিভাবে নির্ধারিত রেট অমান্য করে কমবেশ করে এর লেনদেন বৈধ হবে কি না? যথা ডলারের সরকারি রেট ৭৭ টাকা এমতাবস্থায় কেউ তা ৭৫ বা ৭৮ টাকায় বিক্রি করলে বৈধ হবে কি না?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এ ধরনের লেনদেনের অবকাশ রয়েছে। কেননা ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা ভিন্নজাতীয় সাব্যস্ত করে এর লেনদেনে অতিরিক্ততা ও আধিক্যকে বৈধ বলা হয়েছে এবং উক্ত আধিক্যের কোনো সীমা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। তাই স্বকীয়ভাবে এ ধরনের লেনদেনকে বৈধ বলা যায়। এ ধরনের লেনদেন সুদি হবে না; কিন্তু নিম্নোক্ত দিকগুলো বিবেচনায় এ ধরনের লেনদেন পরিহারযোগ্য।

(ক) উক্ত পদ্ধতিকে যাতে কখনো সুদের হীলা বানানো না যায়।

(খ) تسعير তথা সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার ফলে যথা বিভিন্ন সময় সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ বৈধ তদ্রূপ মুদ্রার মূল্য নির্ধারণও বৈধ হবে এবং মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার পর এর বিরোধিতা করা অবৈধ। এর দুইটি কারণ রয়েছে–

(১) প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো, যে কাজ আল্লাহদ্রোহী বা গোনাহের হবে না ওই সব কাজে সরকারের আনুগত্য ওয়াজিব।

(২) যে ব্যক্তি যে দেশে বসবাস করবে সে কথা এবং কাজে এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করে যে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দেশের কোনো আইন গোনাহের ওপর বাধ্য করবে না, ততক্ষণ সে ওই সব আইন অবশ্যই মেনে চলবে। (কাগজী নোট আওর কারেন্সী কা হুকুম পৃ. ৪০)

ঋণের পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশের কারেন্সি নোটের লেনদেন

যেহেতু একই দেশের কারেন্সির লেনদেন ঋণ পদ্ধতিতে বৈধ। যার ব্যাখ্যা পূর্বের আলোচনায় পেশ করা হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য দেশের কারেন্সির লেনদেনও ঋণ পদ্ধতিতে বৈধ হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বকর আমরের নিকট থেকে আজকের দিনে এক মাসের জন্য একশ' ডলার ঋণ নেয় এবং এক মাস পরে বকর আমরকে ডলারের পরিবর্তে বাংলাদেশি টাকা আদায় করে তাহলে উক্ত লেনদেন বৈধ হবে। এক

মাস পরে বকর আমরকে যে ডলারের পরিবর্তে বাংলাদেশি টাকা আদায় করছে তার দুটি পদ্ধতি হতে পারে। (ক) উক্ত লেনদেনের শুরুতেই উভয়ে এই চুক্তিবদ্ধ হবে যে বকর আমরকে এক মাস পরে ডলারের পরিবর্তে বাংলাদেশি টাকা আদায় করবে। (খ) শুরুতে এ ধরনের কোনো চুক্তি উভয়ের মধ্যে থাকবে না তবে নির্ধারিত সময় আসার পর উভয়ের সম্মতিক্রমে এই কাজটা করবে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং প্রথম পদ্ধতিও বৈধ; তবে শর্তটা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা কর্জ-ঋণ হলো ওই সব লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত, যা শর্ত ফাসিদ হলেও লেনদেন ফাসিদ হয় না। বরং ফাসিদ কোনো শর্ত থাকলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাসিদ হয়ে যায়। প্রথম পদ্ধতিতে যখন শর্ত ফাসিদ হয়ে গেল বরং শর্তটা না থাকার মতো হলো। তাই বকর আমরকে ডলারও আদায় করতে পারে বাংলাদেশি টাকাও আদায় করতে পারে। বাংলাদেশি টাকা দেওয়ার জন্য আমর বকরকে বাধ্য করতে পারবে না। এ কথা বলে যে, চুক্তি মতে তোমাকে বাংলাদেশি টাকাই আদায় করতে হবে।

ঋণের উক্ত লেনদেনে পরিশোধের দিনের মূল্যই ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ যেদিন বকর আমরকে একশ' ডলারের পরিবর্তে বাংলাদেশি টাকা আদায় করবে ওই দিনের ডলারের রেট ধর্তব্য হবে। তাই বকরের জন্য ওই দিনের রেটের চেয়ে বেশি বা কম আদায় করার অবকাশ থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ, বকর যেদিন আমরের নিকট থেকে ডলার ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছে ওই দিন ডলারের মূল্য ছিল ৭৫ টাকা; তবে যেদিন সে ডলারের পরিবর্তে বাংলাদেশি টাকা আদায় করছে ওই দিন ডলারের রেট ৭৭ টাকা এমতাবস্থায় বকর আমরকে ৭৭ টাকা হিসাবে বাংলাদেশি টাকা পরিশোধ করবে। তার কারণ হলো, ঋণের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, এই القرض تقضى بامثالها অর্থাৎ ঋণের মধ্যে যা নিয়েছিল তার অনুরূপ পরিশোধ করতে হবে।

বিচারপতি তাকী উসমানী (দা.বা.) Indexation তথা সূচকসংক্রান্ত মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন–

لان القروض يجب فى الشريعة الاسلامية ان تقضى بامثالها (احكام الاوراق النقدية ٣١)

অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ঋণের অনুরূপ পরিশোধ করা জরুরি। উপরোক্ত মূলনীতির চাহিদা হলো, বকর আমরকে একশ' ডলার আদায় করা। মূলত ঋণের অনুরূপ তো হলো ডলার। কিন্তু সে যখন ডলার আদায় করছে না সুতরাং ওই দিনের একশ' ডলারের সমান বাংলাদেশি টাকা আদায় করবে। তাই সে যদি ৭৫ টাকা ধরে একশ' ডলারের পরিবর্তে বাংলাদেশি টাকা আদায় করে তাহলে সে একশ' ডলার থেকে কম দিল। যদি ৭৭ টাকার বেশি হিসাবে একশ' ডলারের পরিবর্তে বাংলাদেশি টাকা আদায় করে তাহলে ঋণ যা দিয়েছিল তার তুলনায় বেশি হয়ে যাবে। ফলে পরিশোধের ক্ষেত্রে যেই অনুরূপতা পালনের বাধ্যবাধকতা শরীয়তে রয়েছে, তা আর বহাল থাকবে না। এ ক্ষেত্রে ঋণ এবং সাধারণ বাঈয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো বাঈয়ের মধ্যে কমবেশ করা মূলত জায়েয তবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে কমবেশ করাও নাজায়েয। কিন্তু সেটাকে সর্বাবস্থায় সুদি লেনদেন বলা যাবে না। তবে ঋণের মধ্যে এটা নাজায়েয কেননা ঋণের লেনদেনে কমবেশ করা যায় না। উক্ত পার্থক্য দ্বারা এই মাসআলাটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যদি বকর আমরকে সৌদি আরবে এক হাজার রিয়াল ঋণ হিসেবে দেয় এবং আমর এর পরিবর্তে বাংলাদেশে ওই এক হাজার রিয়াল সমান বাংলাদেশি টাকা বকর বা তার কোনো এজেন্ট বা আত্মীয়স্বজনের নিকট আদায় করে তাহলে মূলত এর অনুমতি আছে। তবে এতে যদি দেশীয় আইনের কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকে তাহলে আইন লঙ্ঘনের কারণে সে গোনাহগার ও অপরাধী হবে এবং এর ওপর পূর্বে আলোচিত 'সুফতাজাহ' বিষয়ক প্রশ্নও আসবে, যার উত্তর সবিস্তারে পূর্বের আলোচনায় পেশ করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : উপরোক্ত ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋণ পরিশোধের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। এর থেকে কমবেশ করে লেনদেন বৈধ হবে না। উক্ত কমবেশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই কমবেশ, যা قيمت مثل তথা অনুরূপ মূল্যের বিপরীত।

অনুরূপ মূল্যের তিনটি পদ্ধতি

(ক) ব্যাংক রেট মতে। (খ) খোলা বাজারের দর মতে। (গ) উভয়টার মাঝামাঝি রেট।

উদাহরণস্বরূপ ঋণ পরিশোধের দিন ডলারের ব্যাংক রেট ৭৫ টাকা, ওপেন মার্কেট রেট ৭৭ টাকা। এমতাবস্থায় ঋণগ্রহীতার এখতিয়ার থাকবে সে ৭৫ টাকা হিসাবেও আদায় করতে পারে বা ৭৭ টাকা হিসাবেও আদায় করতে পারে বা উভয়টার মাঝামাঝি ৭৬ টাকা হিসাবেও আদায় করতে পারে। তবে ৭৪ বা ৭৮ টাকা হিসাবে আদায় করা জায়েয হবে না।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় মাতা-পিতার ভূমিকা

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন অগণিত নিয়ামত, যা গুনে-পড়ে শেষ করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها "আল্লাহর নিয়ামত তোমরা গুনে-পড়ে শেষ করতে পারবে না।"

এই নিয়ামতের মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হলো সন্তান-সন্ততি। স্বাভাবিকত বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবল ইচছা জাগে আমাদের সন্তান-সন্ততি হোক। এর জন্য দু'আ করা হয়। সময় দীর্ঘায়িত হলে বিভিন্ন চিকিৎসাও গ্রহণ করা হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে উক্ত নিয়ামত দান করেন। কাউকে ছেলে দেন, কাউকে মেয়ে, কাউকে উভয়টি। আবার অনেককে এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিতও করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا

যাকে চান মেয়েসন্তান দান করেন, যাকে চান ছেলে দান করেন। আবার অনেককে ছেলেমেয়ে উভয়টা দান করেন, যাকে ইচ্ছা সন্তানহীনও রাখেন। (সূরা ৪৯, ৫০)

সন্তানের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে (দোযখের) অগ্নি থেকে রক্ষা করো...। (আততাহরীম ৬)

বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি অগ্রগতি ও অস্তিত্ব নতুন প্রজন্মের ওপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই ইসলাম সন্তান-সন্ততিদের তারবিয়ত ও দীক্ষাকে একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। সন্তানের তারবিয়তের ব্যাপারে হাদীস শরীফে অগণিত ফজীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে প্রতীয়মান হয়, সন্তান-সন্ততির দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান ও তারবিয়ত মাতা-পিতার জন্য আবশ্যক এবং তা এমন একটি পবিত্র আমল, যার মাধ্যমে তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন–

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

যে ব্যক্তি দুটি মেয়েসন্তানকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করবে কিয়ামত দিবসে আমি এবং সে এভাবে থাকব। তা বলে দুটি আঙুলকে মিলিয়ে ইশারা করেছেন। (মুসলিম ২/৩৩০ বাবু ফজলিল ইহসান ইলাল বানাত)

সুনানে ইবনে মাজাতে হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তির তিনটি মেয়েসন্তান হবে এবং খুশিমনে সে তাদের ভরণপোষণ ও লালন-পালন করবে, নিজের সম্পদ থেকে তাদের আহার-বিহার করাবে উক্ত মেয়েসন্তানগণ তার ও দোযখের মাঝে অন্তরায় হবে।

সন্দেহ ও নিরসন

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে এ-সংক্রান্ত হাদীস শরীফে যেসব ফজীলতের কথা বিবৃত হয়েছে বেশির ভাগ মেয়েসন্তানদের ব্যাপারেই এসেছে। তাহলে কি ছেলেসন্তানদের ব্যাপারে এরূপ ফজীলত নেই?

মূলত উক্ত ফজীলত ছেলেমেয়ে উভয়ের বেলায়ই প্রযোজ্য হবে। তবে বিশেষ করে মেয়ের ব্যাপারে বলার কারণ হলো, জাহেলী যুগে মেয়ে জন্মকে কুলক্ষণ এবং মন্দ মনে করা হতো। সে কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদের অধিকারসমূহকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। ছেলের প্রতি ভালোবাসা জাহেলী যুগেও ছিল। কিন্তু মেয়ে জন্ম ছিল তাদের কাছে লজ্জার কারণ। এরূপ অমানবিক কুসংস্কারের মূলোৎপাটন আবশ্যক ছিল। তাই সন্তানের লালন ও তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে হাদীস শরীফে যেসব কথা এসেছে তাতে মেয়েসন্তানের কথাই বেশির ভাগ বলা হয়েছে।

ইসলাম যেমন সন্তানের ওপর মাতা-পিতার বিভিন্ন দায়িত্ব ও হক ন্যস্ত করেছে, তেমনি মাতা-পিতার ওপর সন্তানের কিছু দায়িত্ব ও হক আরোপ করেছে। এ ব্যাপারে ইসলাম কিছু নিয়মনীতিও শিক্ষা দিয়েছে।

মুসলিম উম্মাহ প্রারম্ভলগ্ন থেকেই সাহাবায়ে কেরামের ইলম, আমল ও চরিত্রের আলো আহরণ করে আসছিলেন, শিক্ষাদীক্ষায়ও তাঁদের নিয়মনীতি অনুসরণ করেছেন। যার করণে তাঁরা সুন্দর ও সুষ্ঠু অনুসরণীয় সমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। যুগের আবর্তন-বিবর্তনে ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে উক্ত সুশীল ও সুস্থ সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা থেকে মুসলমানগণ পশ্চাৎপসারিত হয়ে পড়েন। ইসলামী খেলাফতব্যবস্থার আলামত একেক করে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। ইসলাম দুশমন জাতিগুলো চিন্তা করতে লাগল আমাদের পরিকল্পিত দীর্ঘদিনের নীলনকশা বাস্তবায়নের এখনই সময়। যা তাদের অন্তরে দীর্ঘদিন থেকে লালিত ছিল। এটি বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব ছিল, যখন মুসলমানগণ ইসলামী বিধান ও

নিয়মনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের যাবতীয় আকর্ষণ যখন থেকে দুনিয়াপ্রীতি ও অর্থ-লোভের দিকেই নিবদ্ধিত হতে লাগল। সুতরাং মুসলমানগণ যখন দ্বীন থেকে দূরে সরতে লাগল, নিজেদের মধ্যকার ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট হতে লাগল, তখনই বিধর্মীরা নিজেদের চিন্তাধারা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে আরম্ভ করল। যার কারণে মুসলমানদের চিন্তাধারা পরিবর্তন হতে লাগল এবং সামাজিক অবকাঠামো ক্রমে ভেঙে পড়তে লাগল। মুসলমানগণ নিজেদের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে বেদ্বীনদের চিন্তাধারা গ্রহণ করতে লাগল।

ক্রমে কথিত উদারতা ও আধুনিকতার স্লোগানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দূরে অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো। যার প্রভাবে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী স্বর্ণালি সমাজব্যবস্থা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। যে মুসলমান ইসলামী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বকে শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছিল সময়ের ব্যবধানে তাদের দ্বীনি কার্যক্রমের অস্তিত্ব বজায় রাখতেও অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা এখন অন্যের মুখাপেক্ষী।

আমরা যদি ইসলামী সমাজব্যবস্থার অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করি তবে দেখা যাবে ইসলামী শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপক চর্চা থেকে সরে আসাই তার একটি বড় কারণ। এই অনুভূতিও এখন আমরা হারিয়ে বসেছি যে ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর নিয়মনীতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

ইতিহাসের প্রতি নজর ফেরালে প্রতীয়মান হবে যে ওই জাতিই সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়, যারা ভবিষ্যতের সংশোধন ও তারবিয়াতের প্রতি মনোনিবেশ করে। কারণ নবপ্রজন্মরাই প্রতিটি জাতির ভবিষ্যৎ হয়ে থাকে। জাতির এই ভবিষ্যৎকে যারা সৎপথে পরিচালিত করতে পারবে তারাই সফলকাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথ দেখানো এবং তাদের সামগ্রিক তারবিয়াত সম্পূর্ণই মাতা-পিতার ওপর নির্ভরশীল।

মায়ের কোল সন্তানের প্রথম মাদরাসা। শিশুদের তখন যা শেখানো হয় এর প্রভাব তার পুরো জীবনে প্রতিফলিত হয়। তখন যদি দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সঠিক চিন্তাচেতনা ও উত্তম কাজের আলো ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে এসব প্রজন্ম সমাজ থেকে যাবতীয় মন্দ দূর করা এবং উন্নত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্রতী অর্জন করতে পারে।

আমাদের সবার মধ্যে যদি এরূপ চেতনা সৃষ্টি হয় যে দ্বীনি পদ্ধতিতে উন্নত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এবং সর্বোন্নত সমাজ কায়েমের একটি নজির স্থাপিত হোক, যার ফলে পুরো দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হোক তবে আমাদের সে পথেই যেতে হবে, যে পথে এরূপ সফলতা আসতে পারে। এর পুরো দায়িত্ব বর্তাবে সকল মাতা-পিতার প্রতি। সকল মাতা-পিতা একই চিন্তাধারা লালন করে নিজের সন্তান-সন্ততিকে যদি ইসলামী শিক্ষা ও জীবনব্যবস্থার ওপর গড়ে তুলতে সক্ষম হন তবে অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় একটি সুস্থ ও নিরাপদ সমাজব্যবস্থা জাতিকে উপহার দেওয়া যাবে।

সন্তান লালনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিও রাহমাতুললিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) স্পষ্টভাবে বাতলিয়েছেন। অধ্যায়টি বড়ই ব্যাপক এবং দীর্ঘ। এখানে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে সন্তানের লালন সহজ হয়।

১। যারা সন্তানদের তারবিয়াত দেবেন তাঁদের দায়িত্বসমূহ জানা থাকতে হবে। দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া গেলে দায়িত্ব পালন সহজতর হয়।

২। নিজের ঘরে এমনভাবে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিশুরা পরিবেশ থেকেই দ্বীনি বিষয়াদি চর্চা করতে সক্ষম হয়।

৩। সন্তানদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এমন প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দিতে হবে, যেখানে দ্বীনি পরিবেশ থাকে। যেসব প্রতিষ্ঠানে অপসংস্কৃতির চর্চা হবে, সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে উক্ত শিশু অপসংস্কৃতিই আহরণ করবে বৈকি?

৪। সম্প্রতি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া শিশুদের ধ্বংসের একটি বড় কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল এবং মাল্টিমিডিয়া, ফোন ইত্যাদি থেকে যথাসম্ভব সন্তানদের দূরে রাখার চেষ্টা করা। বর্তমানে মোবাইল সংস্কৃতি একটি বড় ধরনের আপদ হিসেবে সক্রিয়। ছবি ভিডিও, অশ্লীলতার গোনাহর পাশাপাশি অর্থ অপচয় তো আছেই, শারীরিক ক্ষতিরও আশঙ্কা প্রবল। একজন শিশু চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে যেমন আপদমুক্ত থাকার অধিকার রাখে, তেমনি তার স্বাস্থ্যও যেন ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় সে ব্যাপারে অভিভাকদের দায়িত্ব অপরিসীম। তাই এই অপসংস্কৃতি থেকে সন্তানদের যথাসম্ভব দূরে রাখা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের তত্ত্বাবধানে রাখা জরুরি।

৫। সন্তানের শিক্ষার পাশাপাশি তার চরিত্র গঠনের প্রতিও মনোনিবেশ করতে হবে মাতা-পিতাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن

কোনো পিতা নিজ সন্তানকে চরিত্র গঠনের চেয়ে উত্তম উপহার দিতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ ১২/১৬০)

আরেক হাদীসে এসেছে–

اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم

"নিজের সন্তানদের স্নেহ করো এবং তাদের উত্তমভাবে তারবিয়াত দাও।" (ইবনে মাজাহ ৪/১৮৯)

আরেক হাদীসে এসেছে–

علموا اولادكم واهليكم الخير وادبوهم

'নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারকে উত্তম বিষয় শিক্ষা দাও এবং তাদের উত্তম তারবিয়াত দান করো।"

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কত সহজভাবে সন্তানদের তারবিয়াতদানের উপদেশ দিচ্ছেন। কেউ যদি পূর্ণ আস্থাশীলতার সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপদেশ ও আদেশ

অনুসারে সন্তানদের চরিত্র গঠন ও তারবিয়াতদানের পাকা ইচ্ছা পোষণ করেন এবং চেষ্টা করেন তবে নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপদেশের বরকত তাঁর অর্জিত হবেই ইনশাআল্লাহ।

বর্তমান সময়ে মুসলিম সন্তান-সন্ততিগণ ইসলামের সঠিক তারবিয়াত থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে অপসংস্কৃতির বেড়াজালে বন্দি হতে চলেছে। পুরো প্রজন্মের কাছেই আজ ইসলামী সংস্কৃতি, সভ্যতা ও উত্তম কাজ অপরিচিতই থেকে যাচ্ছে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা যেন তাদের কাছে নিজেদের মূল জীবনোপকরণ হিসেবেই বিবেচিত হতে চলেছে।

তাই সব ধরনের পার্থিব ছলনা থেকে নিজেকে দূরে রেখে সন্তানদের তারবিয়াতের ব্যাপারে সাহসী ভূমিকা ছাড়া এসব আপদ থেকে তাদের বাঁচানো সম্ভব হবে না।

৬। স্বয়ং মাতা-পিতাদের এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে, যার কারণে সন্তান-সন্ততিদের প্রতি খারাপ প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা থাকে। আবার সন্তাদের প্রতিও কড়া নজর রাখতে হবে। কারণ শিশুরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের কারণে বেশি প্রভাবিত হয়।

৭। মাতা-পিতার জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো, সন্তানদের তারবিয়াত করার ক্ষেত্রে এমন কাজ থেকে নিজেও বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন। শুরু থেকেই সন্তানদেরকেও এরূপ কাজ থেকে বাঁচানো। তাদের অন্তরে আল্লাহ ভয় ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করা।

৮। সন্তানের লালনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করা।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার মধ্যে সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে অকল্পনীয় মোহাব্বত, ভালোবাসা ও স্নেহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই সন্তানের লালনে অনেক সময় স্নেহের কারণে বিভিন্ন প্রবণতা দেখা দেয়। হয়তো অতিরিক্ত স্নেহের কারণে মাতা-পিতা সন্তানের প্রতি খুবই কঠোর হয়ে যান অথবা খুবই নমনীয় হয়ে পড়েন। উভয়টিই কিন্তু প্রযোজ্য নয়। বরং স্নেহ ও কঠোরতা সবই সীমার মধ্যেই থাকা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا

'ওই লোক আমাদের মধ্য হতে নয়, যারা ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের হক সম্পর্কে সচেতন নয়।" (তিরমিযী ১৪)

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর কিতাব আল আদবুল মুফরাদে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হন। তাঁর সাথে একটি শিশু ছিল। যাকে সে নিজের কাছে জড়িয়ে রাখলেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন এই শিশুর ওপর কি তোমার খুবই স্নেহ হয়? উত্তরে বললেন–হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন–

فـاللـه ارحـم بك منك بـه وهو ارحم الراحمين۔

তোমার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এর চেয়ে বেশি রহমকারী। তিনি তো সর্বাধিক রহমকারী।'

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি দেখতেন কোনো সাহাবী সন্তানের প্রতি স্নেহশীল নন, তখন তাঁকে সতর্ক করতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) আল আদবুল মুফরাদে হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, গ্রামের এক লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, আপনি কি শিশুদের চুমু দেন? আমরা তো দিই না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন–

او املك لك ان نـزع الـلـه مـن قلبك الرحمة

'যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তর থেকে স্নেহ দূর করে দেন তবে আমার কী করার আছে।'

মোট কথা হলো, সন্তানদের প্রতি সব সময় এমন কঠোরতাও করা যাবে না, যাতে সে হীনম্মন্য হয়ে পড়ে, আবার এমন স্নেহশীলও হওয়া যাবে না, যাতে তার ভুলগুলোও এড়িয়ে যাওয়া হয়।

সন্তানকে শুরু থেকে যা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন

১। সন্তান যখন শব্দ বলতে শিখবে তখন স্বাভাবিকত আমরা 'মা', বাবা', 'দাদা', 'নানা' ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকি। এর পাশাপাশি তাকে 'আল্লাহ' শব্দটিও শিখিয়ে দেওয়া যায়। মাসুম শিশুর মধুর কণ্ঠে যখন 'আল্লাহ, আল্লাহ' শব্দ শোনা যাবে তখন স্বয়ং মাতা-পিতার অন্তরও আপ্লুত হবে। 'আল্লাহ' শব্দের প্রভাবে শিশুর জীবন যেমন সফলতায় ভরে উঠবে, স্বয়ং মাতা-পিতার প্রতিও এর প্রভাব কম বিস্তৃত হবে না।

২। শিশু যখন বাক্য বলার যোগ্য হবে তখন অন্যান্য ভালো কথাবার্তার পাশাপাশি তাকে কালেমায়ে তায়্যিবাহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শিখিয়ে দেওয়া।

৩। শিশু আরো যোগ্য হয়ে উঠলে উক্ত কালেমার সহজ অর্থ তাকে শিখিয়ে দেওয়া যায়।

৪। ক্রমে শিশু বেড়ে ওঠার সাথে তাকে ইসলামের প্রাথমিক আকীদাগুলো শিক্ষা দেওয়া। যেমন, দুনিয়ার সব কিছু আল্লাহ থেকেই হয়, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। আমাদের খানাপিনা দান করেন আল্লাহ। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সহজ আকীদাগুলো শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৫। শিশুকে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্ত্বা ও গুণাবলি সম্পর্কে সহজ সহজ ধারণাগুলো দেওয়া। যাতে তার মধ্যে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম)-এর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।
৬। শিশুর সাথে বিভিন্ন গল্পচ্ছলে জান্নাত-জাহান্নামের গল্পও করা। নবী-রাসূলদের বিভিন্ন ঘটনাবলির গল্পও করা। তাতে শিশুর সাথে গল্পও হবে; আবার আখেরাত সম্পর্কেও কিছু কিছু প্রাথমিক ধারণা তার মাঝে আসবে।
৭। শিশুর মেধা খুবই স্বচ্ছ ও প্রখর হয়ে থাকে। তাই ছোট ছোট দু'আ-দরূদ ইত্যাদিও খুব ছোট বয়সেই তাদের শেখানো যায়। বরং তখন সে যা শিখবে সারা জীবন তা-ই তার স্মরণে থাকবে। সে কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোট ছোট দু'আগুলো তাদের শেখালে খুব সহজে তারা তা মুখস্থ করে ফেলতে পারবে। আবার মাতা-পিতা যেকোনো কাজ-সংক্রান্ত দু'আগুলো সময়মতো অনুশীলনও করাতে পারেন। যেমন খাওয়ার সময় খাওয়ার দু'আ, ঘুমোনোর সময় ঘুমের দু'আ ইত্যাদি। যাতে এসব দু'আ তার অভ্যাসে পরিণত হয়।
৮। এরপর দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া। প্রাথমিকভাবে সন্তানকে হাফেজে কোরআন বানানোর চেষ্টা করা। হাদীস শরীফে হাফেজে কোরআনের অগণিত ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আলেম বানানো। যদি পুরোপুরি আলেমে দ্বীন বানানো না যায়, তবে তার দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম পালনের জন্য যেটুকু ইলম প্রয়োজন, তা শিক্ষা দেওয়া। এটুকু শিক্ষা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

নামায শিক্ষা দেওয়া

অল্প বয়সেই সন্তানদেরকে নামায শিক্ষা দেওয়া জরুরি। যাতে বড় হলে সর্বদা তা আদায় করতে সচেষ্ট হয়।
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সম্বন্ধে বলেছেন–

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلَاةَ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

যখন সন্তানরা সাত বছরে পদার্পণ করে তখনই তাদের নামায শিক্ষা দান করো। আর দশ বছর অতিক্রম করলে নামাযের জন্য প্রহার করো। তখন তাদের জন্য আলাদা আলাদা বিছানারও ব্যবস্থা করো। (মুসনাদে আহমাদ)
মা যা করেন শিশুরা তা-ই করতে চায়। মুসলমান শিশুরা মায়ের সাথে নামাযেও দাঁড়ায়, রুকুও করে, সিজদাও করে। মায়ের মতো তারা দু'আ করতে চায়। তবে কিছুদিন পর সেগুলো থেকে আনমনা হয়ে পড়ে। প্রথম থেকেই তার আবেগকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। মায়ের সাথে সে নামায পড়ছে সেটাকে মূল্যায়নপূর্বক তাকে উক্ত কাজে উৎসাহিত করতে পারলে সেটা তার অভ্যাসে পরিণত করা যাবে। নামায, দু'আ যেগুলো সে খেলাচ্ছলেই করতে থাকে, সে অবস্থা থেকেই তাকে সেগুলোয় অভ্যস্ত করে দিতে পারলে তাকে নিয়মিত নামাযী বানানো সহজ। যখন থেকে শিশু খেলাচ্ছলে এসব করছে, তখন থেকে সেসব ব্যাপারে তদারকি করতে থাকলে হতে পারে সে আর উক্ত নামায ছাড়বে না।
এসবের পাশাপাশি তাকে পবিত্র কোরআনের ছোট ছোট সূরাগুলোও মুখস্থ করানো যায়, নামাযের দু'আগুলোও। এসব সে খেলতে খেলতেই মুখস্থ করে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

হারাম ও মাকরূহ কাজ হতে নিবৃত্ত রাখা

১। শিশুদের সর্বদা কুফরী কালাম, গালি দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া এবং আজেবাজে কথা বলা হতে উপযুক্ত উপদেশের মাধ্যমে নিবৃত্ত রাখতে হবে। তাদের সম্মুখে সর্বদা মাতা-পিতা এবং বড়দের জিহ্বাকেও সংযত রাখতে হবে, যাতে বড়দের কারণে তারা আদর্শচ্যুত না হয়।
২। তাদেরকে সর্বপ্রকার জুয়া খেলা হতে নিবৃত্ত রাখতে হবে। যেমন–তাস, পাশা, দাবা, লুডু, কেরাম ইত্যাদি। সন্তানদের সাধারণত সময় কাটানোর জন্য খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখা হয়। তাতে এমন খেলাধুলায় যেন অভ্যস্ত না হয়ে পড়ে যেগুলো পরে গিয়ে তার জন্য জুয়ায় রূপান্তরিত হবে।
৩। তাদের আজেবাজে পত্রিকা ও বই পড়া হতে নিবৃত্ত রাখা। সাথে সাথে অশ্লীল ছবি, ডিটেকটিভ ও যৌন গল্প পড়া হতে নিবৃত্ত রাখা আবশ্যক। সিনেমা, টেলিভিশন, ভিডিও দেখা হতেও নিষেধ করতে হবে। কারণ ছবি-ভিডিও ইত্যাদি তাদের চরিত্রকে কলুষিত ও ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে।
৪। ধূমপান ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধ করতে হবে। আর তাকে বোঝাতে হবে যে সমস্ত চিকিৎসকের মিলিত মতামত হলো, ওই সমস্ত জিনিস শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং যক্ষ্মা ও ক্যান্সারের প্রধান কারণ। ধূমপান দাঁতকে নষ্ট করে, মুখে দুর্গন্ধ আনয়ন করে এবং বক্ষব্যাধির কারণ হয়। এতে কোনো উপকারিতা নেই। তাই এটা পান করা ও বিক্রয় করা হারাম। এর পরিবর্তে কোনো ফল বা অন্য কোনো দ্রব্যাদি খেতে পরামর্শ দেওয়া যায়।
৫। সন্তানদের সর্বদা কথা ও কাজে সত্যবাদী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাদের সম্মুখে কখনো মিথ্যা কথা বলা যাবে না, যদিও তা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে বলা হোক না কেন। তাদের সাথে কোনো ওয়াদা করলে তা পালনে সচেষ্ট হতে হবে।
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন–

مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كِذْبَةٌ

যে ব্যক্তি কোনো বাচ্চাকে বলে, এসো তোমাকে কিছু দেব। তারপর যদি তাকে না দেওয়া হয়, তবে সে মিথ্যাবাদী। (মুসনাদে আহমাদ)
৬। যেকোনো হারাম মাল খাওয়ানো থেকে সন্তানদের বিরত রাখা। যেমন–ঘুষ-সুদ, চুরি-ডাকাতি ও ধোঁকার পয়সায় সন্তানদের আহার করালে এবং লালন-পালন করলে সেসব সন্তান অসুখী, অবাধ্য ও নানা ধরনের পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এসবের প্রভাবে তারাও উক্ত হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। তাই এরূপ

পয়সা যেন তাদের শরীরে প্রবেশ না করে মাতা-পিতাকে সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা আবশ্যক।

৭। সন্তানদের জন্য ধ্বংস বা গজবের দু'আ করা উচিত নয়। কারণ সন্তানদের ওপর মাতা-পিতার দু'আ বেশি কবুল হয়। দু'আ ভালো ও মন্দ উভয় অবস্থাতেই কবুল হয়ে যায়। ফলে তারা আরো বেশি গোমরাহ হয়ে যাবে। বরং এ কথা বলা উত্তম যে আল্লাহ তোমার সংশোধন করুন। তোমাকে হেদায়াত করুন।

শরীয়তসম্মত পোশাক-পরিচ্ছদ ও পর্দা পালনে অভ্যস্ত করা

১। বাল্য কাল থেকেই মেয়েদের শরীর আবৃত করার জন্য উৎসাহিত করা। যাতে বড় হওয়ার পর সে এর ওপর আরো মজবুত হয়ে চলতে পারে। তাকে কখনও ছোট জামা পরিধান করানো ঠিক নয়। অথবা প্যান্ট বা শার্ট একককভাবে কোনোটাই পরাতে নেই। কারণ এসব কাফিরদের ও পুরুষের পোশাকের মতো। ছোটকাল থেকে তাকে নেকাব পরায় অভ্যস্ত করা উচিত। বড় হলে তো তাকে মুখমণ্ডল ঢেকেই চলতে হবে। আর এমন বোরখা পরিধান করাতে হবে, যা লম্বা ও ঢিলেঢালা হবে এবং যা তার সম্মানের হেফাজত করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক, যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে) কিছু অংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না। (সূরা আহযাব ৩৩ : ৫৯ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে আরো ইরশাদ করেন–

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

এবং প্রাক জাহেলী যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। (সূরা আহযাব, ৩৩ আয়াত)

২। ছেলেমেয়ে উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত করা। অর্থাৎ ছেলেরা ছেলেদের পোশাক ও মেয়েরা মেয়েদের পোশাক পরিধান করবে, যাতে তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে পার্থক্য করা যায় এবং চেনা যায়। আর তারা যেন বিধর্মীদের পোশাক-পরিচ্ছদ; যেমন–সংকীর্ণ প্যান্ট বা এ-জাতীয় পোশাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকে। এ ছাড়া অন্য যেসব ক্ষতিকারক অভ্যাস রয়েছে, তা থেকে তারা যেন বিরত থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন :

لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষের বেশধারী মহিলা ও মহিলাদের বেশধারী পুরুষদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। (বুখারী হা. ৫৮৮৫)

আরেক হাদীসে আছে, 'পুরুষদের মধ্যে যারা মহিলাদের মতো চলাফেরা করে এবং মেয়েদের মধ্যে যারা পুরুষের মতো চলাফেরা করে তাদের ওপরও আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ।'(মুসনাদে আহমদ ৩১৫১) আরেক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা এরূপ নারী-পুরুষদের ওপর অত্যন্ত নারাজ ও রাগান্বিত হন। (আল আদাব লিইবনি আবী শায়বা হা. ২১৫)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ)

৩। ছেলের যখন দাড়ি গজাবে তখন তার দাড়িতে যেন ক্ষুর না লাগায় এর তদারকী করা খুবই জরুরি। কারণ দাড়ি কাটা বা ছাঁচা সার্বক্ষণিক গোনাহ। যদিও আমাদের সমাজ এ ব্যাপারে বেশি উদাসীন; কিন্তু ইসলামে এর গুরুত্ব অত্যধিক। দাড়ি রাখা সুন্নাত কিন্তু একমুষ্টির চেয়ে কম হলে কাটা বা ছাঁচা হারাম। বিভিন্ন গোনাহের কাজ আছে, যা যখন করল তখনই গোনাহ লেখা হয়। কিন্তু দাড়ি কাটলে বা ছাঁচলে সর্বক্ষণ গোনাহে লিপ্ত থাকতে হয়। তাই ছেলের এই বিষয়টির প্রতি মাতা-পিতার অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

চারিত্রিক গুণাবলি ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া

১। বাচ্চাদের এমন অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে, যাতে তারা প্রতিটি উত্তম কাজ ও উত্তম স্থানে ডানকে প্রাধান্য দেয় এবং প্রতিটি অনুত্তম কাজে বামকে প্রাধান্য দেয়। প্রতিটি ভালো কাজ আরম্ভ করার সময় যেন বিসমিল্লাহ বলে।

২। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা। যেমন–হাত-পায়ের নখ ছোট করা, খাবার গ্রহণের পূর্বে ও পরে হস্তদ্বয় ধৌত করা, এস্তেঞ্জা করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া, প্রস্রাবের পর টিস্যু অথবা ঢিলাকুলুখ ব্যবহার করা এবং পানি দ্বারা ভালোভাবে ধৌত করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৩। আযানের সময় নীরব থেকে আযানের জবাব দেওয়া এবং আযানের পর দু'আ পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

আযানের দু'আ হলো–

اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

হে আল্লাহ! আপনি এই পরিপূর্ণ আহ্বানের ও নামাযের রব। অনুগ্রহ করে মুহাম্মাদ (সা.) কে অছিলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আর যে প্রসংশিত স্থানের ওয়াদা আপনি করেছেন, তা তাকে দান করুন। (বুখারী)

৪। যদি সম্ভব হয়, তবে প্রতিটি সন্তানকে আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা অথবা গায়ের চাদর আলাদা দেওয়া। উত্তম হচ্ছে, মেয়েদের জন্য আলাদা এবং ছেলেদের জন্য আলাদা কামরার

ব্যবস্থা করা। এটা তাদের চরিত্র ও স্বাস্থ্য উভয়টার জন্যই ভালো।

৫। খারাপ বন্ধুদের সাথে ওঠাবসার ব্যাপারে সর্বদা সাবধান করা।

৬। আজেবাজে বই-পুস্তক পড়া থেকে বিরত রাখা। যেকোনো বই পড়তে হলে তার লেখক সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ বইয়ের মাধ্যমে লেখকের প্রভাব পাঠকের প্রতিও বিস্তৃত হয়। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, কাউকে উস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও যাচাই করা প্রয়োজন। বর্তমান ফিতনার যুগে বিভিন্ন আজেবাজে বই-পুস্তক তো আছেই, ধর্মের নামেও অনেক বই-পুস্তক বাজারে পাওয়া যায় যেগুলো প্রকাশ করা হয় ফিতনা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে। এ সমস্ত বই কেউ ফ্রি বিতরণ করলেও তা পড়া বাঞ্ছনীয় নয়। বরং ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শে বিশ্বাসী বরেণ্য আলেমদের বই-পুস্তক পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। যাতে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয়। এ ক্ষেত্রেও মাতা-পিতার তত্ত্বাবধান অতীব প্রয়োজন।

৬। তাদের মধ্যে সালাম দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। বাড়ি-ঘর, রাস্তা এবং শ্রেণীকক্ষ নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রে এই বলে সালাম বিনিময় করবে। 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।'

৭। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব রাখার ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া এবং তাদের কষ্ট দেওয়া হতেও তাদেরকে বিরত রাখতে হবে।

৮। বাচ্চাদের মধ্যেও এমন অভ্যাস ও আবেগ গড়ে তোলা, যাতে তারা মেহমানদের সম্মান করে এহতেরাম করে এবং উত্তমভাবে তাদের মেহমানদারী করে। প্রয়োজনে এসব বিষয়ে তাদের ঘরোয়াভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৯। সন্তানদের জন্য সব সময় দু'আ করা। কারণ মাতা-পিতার দু'আ সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বড় অর্জন। আল্লাহ তা'আলা সন্তানদের বেলায় মাতা-পিতার দু'আই বেশি কবুল করেন।

মাত-পিতার সাথে সন্তানের আচার-ব্যবহার কিরূপ হওয়া জরুরি

সন্তানদেরকে নিম্নোক্ত উপদেশগুলো পালনে অভ্যস্ত বানাতে হবে। তাতে সন্তান দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ।

১। মাতা-পিতার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলা। তাদের সাথে এমন কোনোই আচরণ করা যাবে না, যাতে তাদের 'উহ' শব্দ বলতে হয়। তাদের সাথে ধমক দিয়ে কথা না বলা। বরং সব সময় তাদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা।

২। সর্বদা মাতা-পিতার আদেশ-নিষেধ পালন করতে তৎপর হওয়া, তবে কোনো পাপের কাজ ব্যতীত। কারণ স্রষ্টার সাথে নাফরমানী করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

৩। তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। কখনও তাদের সম্মুখে বেয়াদবী করা যাবে না। কখনও তাদের প্রতি রাগের সাথে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা।

৪। সর্বদা মাতা-পিতার মান, সম্মান ও ধনসম্পদের হেফাজতে সচেষ্ট হওয়া। তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের কোনো টাকা-পয়সা স্পর্শ না করা।

৫। এমন কাজে তৎপর হওয়া, যাতে তাঁরা খুশি হন, যদিও তাঁরা সে সবের হুকুম নাও করে থাকেন। যেমন– তাদের খেদমত করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে দেওয়া। আর সব সময় ইলম অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

৬। নিজের সর্বাবিধ কাজে মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করা। তাদের কোনো পরামর্শ মনোপূত না হলে তাদের নিকট ওযর পেশ করা, বিষয়টি তাদের বোধগম্য করার চেষ্টা করা। অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধিতা না করা।

৭। সর্বদা তাদের ডাকে হাসিমুখে উপস্থিত হওয়া। তাদের সামনে হাজির হওয়ার পর খুব ভক্তির সাথে বলা– হে আমার মাতা! হে আমার পিতা! অথবা যেভাবে ডাকার অভ্যাস সেভাবে তাদের সম্বোধন করা।

৮। তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদেরও সম্মান করা। তাদের জীবদ্দশায় তো করতে হবেই, মৃত্যুর পরও করা।

৯। তাদের সাথে ঝগড়া তো করা যাবেই না বরং তাদের সামনে উঁচু গলায় কথা বলাও অনুচিত। তাদের ভুলভ্রান্তি খুঁজতে তৎপর না হওয়া। যদি তাদের কোনো কাজ ভুল বলে ধারণা হয় তবে আদবের সাথে তাদেরকে সঠিক বিষয়টি জানাতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

১০। তাদের অবাধ্য না হওয়া। তাদের কথাবার্তা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করা। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। মাতা-পিতার সম্মানের খাতিরে কোনো ভাইবোনদের কষ্ট না দেওয়া।

১১। তাদের কেউ সম্মুখে উপস্থিত হলে দাঁড়িয়ে বা যেভাবে সম্মান করা উচিত সেভাবে সম্মান দেখানোর চেষ্টা করা।

১২। বাড়িতে 'মা'কে তাঁর কাজে সর্বদা সহযোগিতা করা। আর পিতার কাজে সহযোগিতা করতে কখনও পিছপা না হওয়া।

১৩। মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত কোথায়ও বের না হওয়া, সে কাজ যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন। যদি বিশেষ অসুবিধার কারণে বের হতে হয়, তাহলে তাদের নিকট ওযর পেশ করা। আর দেশের কিংবা শহরের বাইরে গেলে, সর্বদা তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা।

১৪। অনুমতি ব্যতীত কখনও তাদের কক্ষে প্রবেশ না করা। বিশেষ করে তাদের ঘুম কিংবা বিশ্রামের সময়।

১৫। তাদের পূর্বে খাবার গ্রহণ না করা। খানাপিনার সময় তাদের একরাম করতে সচেষ্ট হওয়া।

১৬। তাদের সম্মুখে কখনও মিথ্যা কথা না বলা। তাদের কোনো কাজ পছন্দ না হলে তাদের দোষ বের করতে তৎপর না হওয়া।

১৭। তাদের সম্মুখে স্ত্রী বা সন্তানদের প্রাধান্য না দেওয়া। সর্ব অবস্থাতেই তাদের রাজিখুশি রাখতে তৎপর থাকা।

তাদের রাজিখুশিতেই আল্লাহপাক রাজি হবেন। আর তাদের নারাজিতে, আল্লাহ তা'আলা নারাজ হবেন।

১৮। যথাসম্ভব তাদের সম্মুখে কোনো উঁচু স্থানে উপবেশন না করা। তাদের সম্মুখে কখনই অহংকারের সাথে পদদ্বয়কে লম্বা করে না দেওয়া।

১৯। কখনও পিতার সম্মুখে নিজের বড়ত্ব না দেখানো। যত বড় ঊর্ধ্বতন কর্মচারী-কর্মকর্তাই হোক না কেন। তাদের কোনো ভালো কাজকে খারাপ না বলা এবং তাদের কোনো প্রকার কষ্ট না দেওয়া, যদিও তা মুখের কথার দ্বারাই হোক না কেন।

২০। তাঁদের জন্য খরচের ব্যাপারে কখনও এত কৃপণতা করা যাবে না, যাতে তাঁরা কোনো অভিযোগ উত্থাপন করেন। এটা একজন সন্তানের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। সেরূপ করা হলে পরে নিজ সন্তানদের মধ্যেও তা দেখতে হতে পারে। তাই নিজ সন্তানদের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, মাতা-পিতার সাথে সন্তানের পক্ষ থেকে যে ব্যবহার করা হবে, সন্তানদের নিকট হতে সে ব্যবহারই তার প্রাপ্য হবে।

২১। বেশি বেশি মাতা-পিতার দেখাশোনা করা এবং তাদের সর্বদা হাদিয়া উপহার দিতে চেষ্টা করা, তারা যে কষ্ট করে তোমাকে প্রতিপালন করেছেন, তজ্জন্য তাদের শুকরিয়া আদায়ে তৎপর হওয়া। মনে রাখতে হবে, তুমি যেমন আজ তোমার সন্তানদের আদর করো এবং তাদের জন্য কষ্ট করো, একদা তারাও তোমার জন্য ওই রকমই কষ্ট করতেন।

২২। একজন সন্তানের নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও হকদার হলেন তার মাতা। তারপর তার পিতা। মনে রাখতে হবে, মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।

২৩। যদি তাদের নিকট কোনো কিছু চাইতে হয়, তবে নম্রভাবে তা চাওয়া। আর যখন তা তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত হবে, তখন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদি মাতা-পিতা দিতে অপারগ হন, তবে তাদের ওযর গ্রহণ করা। তাদের নিকট এমন অনেক কিছু দাবি করা যাবে না, যা দিতে তাদের কষ্ট হবে।

২৪। যখন সন্তান রিযক উপার্জনে সক্ষম হয়, তখন হতেই রিযক অন্বেষণে তৎপর হওয়া। আর সাথে সাথে মাতা-পিতাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করা।

২৫। মনে রাখতে সন্তানের ওপর মাতা-পিতার হক আছে। তেমনিভাবে স্ত্রীরও। তাই প্রত্যেকের হককে সঠিকভাবে আদায় করতে সচেষ্ট হতে হবে। আর তাদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য দেখা দিলে তা দূর করতে চেষ্টা করা এবং গোপনে গোপনে উভয়কেই হাদিয়া প্রদান করা।

২৬। যদি কখনও স্ত্রীর সাথে মাতা-পিতার মনোমালিন্য হয়, তবে তার উত্তম বিচারের চেষ্টা করতে হবে এবং স্ত্রীকে এটা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা যে তুমি তার পক্ষে আছ যদি সে হকের ওপর থাকে। কিন্তু মাতা-পিতাকে খুশি করাও তোমার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

২৭। যদি বিয়ে কিংবা তালাকের ব্যাপারে মাতা-পিতার সাথে তোমার কোনো মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে শরীয়তের আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা, ওটাই হবে জন্য উত্তম সাহায্যকারী।

২৮। ভালো বা মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই মাতা-পিতার দু'আ কবুল হয়। তাই তাদের ওপর বদ দু'আ হতে বাঁচতে চেষ্টা করা।

২৯। অন্যদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে সচেষ্ট হওয়া। যে অন্যদের গালি দেয়, সে নিজেও গালি খায়।

রাসূল (সা.) বলেছেন :

مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ :نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

কবিরাহ গোনাহের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। সাহাবীগণ (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কেউ কি তার মাতা-পিতাকে গালি দেয়? উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ, সে অন্যের পিতাকে গালি দেবে সেও তার পিতাকে গালি দেবে। সে অন্যের মাতাকে গালি দেবে সেও তার মাতাকে গালি দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০। মাতা-পিতার সাথে বেশি বেশি সাক্ষাৎ করা। তাদের পক্ষ হতে দান-খয়রাত করতে থাকা। সর্বদা তাদের জন্য এই বলে বেশি বেশি করে দু'আ করা।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

হে আমার রব! তুমি আমার মাতা-পিতার ওপর দয়া করো, যেমনিভাবে তারা আমাকে ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছেন। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২৪ আয়াত)

অন্যত্র আছে :

رَبِّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مؤمِنا وَلِلْمؤمِنِيْنَ وَالْمُؤمِنَاتِ

হে আমার রব! আমাকে এবং আমার মাতা-পিতাকে এবং ঈমানসহ যারা আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং অন্য মুমিন নারী-পুরুষদেরকে ক্ষমা করে দাও। (সূরা নুহ, ২৯ আয়াত)

সন্তানের মধ্যে এসব অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাদের সচেতন করা আবশ্যক।

প্রতিদিন জন্ম নেওয়া লাখো শিশু যদি এরূপ একটি সুনিয়ন্ত্রিত ধাঁচে বেড়ে ওঠে তবে তাদের হাতে গড়ে ওঠা আগামীর সমাজব্যবস্থা হবে অত্যন্ত নিরাপদ ও সুষ্ঠু। বর্তমান চতুর্মুখী ফিতনার যুগে সমাজ যেভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন গন্তব্যের দিকে ধাবমান, তাতে মুসলিম সন্তানদের এভাবে লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানের বিকল্প নেই। তাই সকল মাতা-পিতাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে, সমাজকে উত্তম, চরিত্রবান, মুত্তাকী, আল্লাহভীরু ও দেশপ্রেমিক সন্তান উপহার দেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১২

ইমামের পেছনে কেরাত

আমরা পূর্বেও কয়েকবার উল্লেখ করেছি, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। শুধু চার-পাঁচটি মাসআলা নিয়ে লম্ফঝম্ফ কিংবা তর্জনগর্জন, এটা ইসলামের চরিত্রের সাথে যায় না। কিন্তু পুরো ইসলামকে বাদ দিয়ে কয়েকটি সাধারণ মাসআলা নিয়েই লা-মাযহাবীদের ঘরকন্না। তাই এদের কাছে পুরো নামাযের কোনো চিত্র নেই। বরং তারা হাত বাঁধার পরপরই ইমামের পেছনে কেরাত পড়ার মাসআলাটির অবতারণা করে। অর্থাৎ কেউ যখন ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়াবে সে ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করবে কি করবে না? কিংবা সূরা ফাতিহা পাঠ করবে কি করবে না? আমরা অনেকেই বিস্মৃত হয়ে মনে করি, এই মাসআলাটা যেন লা-মাযহাবীদেরই নিজস্ব সম্পত্তি। অথচ বাস্তব কথা হচ্ছে, এই মাসআলা নিয়ে পূর্ববর্তী উলামাদের মাঝে বিস্তর মতবিরোধ চলে আসছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে প্রমাণাদি নিয়েই তো আপনাদের অহর্নিশি অতিবাহিত হয়।

দুটি বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি

আমরা সাধারণত এখানে দুটি বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে থাকি। প্রথমত, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ব্যতীত অবশিষ্ট তিন ইমামের মতে, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। এর পক্ষে স্বতন্ত্র প্রমাণাদিও রয়েছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

فاقرؤا ما تيسر من القرآن

উক্ত আয়াত থেকে নামাযে কেরাত পড়ার ফরজিয়্যত তথা অকাট্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। (সূরা মুযযাম্মিল-২০)

এই আয়াতে যে কেরাতের কথা বিবৃত হয়েছে, তা কি কেবল সূরা ফাতিহার মধ্যে সীমাবদ্ধ? ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত হচ্ছে, উক্ত আয়াতে কেরাত বলতে সূরা ফাতিহাই উদ্দেশ্য। এই আয়াতের অধীনে ইমামের পেছনে কেরাত পড়ার কোনো আলোচনাই পূর্ববর্তী ইমামরা করেননি। আমরা এখানে বড় ধরনের ভ্রান্তিতে নিপতিত হই যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার যে প্রমাণাদি ইমামরা উপস্থাপনা করে থাকেন, আমরা সেগুলোকে মুক্তাদীর জন্য ধরে নিই। অথচ বাস্তবতা কিন্তু সম্পূর্ণ এর বিপরীত। আপনার সামনে যখনই কোনো প্রমাণ উপস্থাপিত হবে, সাথে সাথে আপনি বলে দিন, এই দলিলের মাধ্যমে আইম্মায়ে ছালাছা (পূর্ববর্তী তিন ইমাম) নামাযে সূরা ফাতিহার সমপরিমাণ কেরাত পড়া ফরয হওয়াটা সাব্যস্ত করেছেন। আপনাদের স্মরণ থাকার কথা, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশবিশেষ। তাই তাদের মাযহাবে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ করা হয়। কেউ যদি বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামায অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বক্তব্যটির উত্তর প্রদান করা হয়েছে। সেসব নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাদের মতে, নামাযে কেরাত পড়ার যে ফরজিয়্যত, তা সূরা ফাতিহা পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের মতে, নামাযে কেরাত পড়া ফরয। চাই তা সূরা ফাতিহা হোক বা অন্য কোনো সূরা হোক। আমাদের দলিল-প্রমাণ কোথায়? একদম সোজা উত্তর, যেখানে সূরা ফাতিহার প্রমাণাদি রয়েছে, সেখানেই আমাদের দলিল-প্রমাণাদি।

সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মেলানো প্রসঙ্গে

আল্লাহর রাসূল (সা.) জীবদ্দশায়ই কখনো অন্য সূরা না মিলিয়ে সূরা ফাতিহা পড়েছেন বলে কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। সাথে সাথে অন্য সূরা পড়ে সূরা ফাতিহা ছেড়ে দিয়েছেন, এ ধরনের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। তাই আইম্মায়ে ছালাছার দাবি, নামাযে সূরা ফাতিহা ফরয। আর হানাফীদের দাবি, শুধু কেরাত পড়াই ফরয। দাবি ভিন্ন হলেও উভয়ের প্রমাণাদি কিন্তু এক ও অভিন্ন। তবে স্মরণ রাখবেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কাছেও সূরা ফাতিহার গুরুত্ব অনেক। তাঁর মত হচ্ছে, কেরাত পড়া ফরয আর সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতের শ্রেষ্ঠত্ব

আমরা যখন উভয় মাযহাবের দলিল-প্রমাণের চুলচেরা নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করি, তখন আমরা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতামতকেই কোরআন-সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী দেখতে পাই। কারণ পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

فاقرؤا ما تيسر من القرآن

পবিত্র কোরআনের যে অংশই তোমার কাছে সহজ পাঠ্য মনে হয়, তা-ই পাঠ করো। এখন এই বিধানকে যদি কোনো সূরার সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়, তাহলে প্রকারান্তরে পবিত্র কোরআন কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো সূরা পড়ার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয় এবং সঙ্কুচিত তো হয়ই। বরং এটাকে এক প্রকারের ইজবার (বাধ্য করা) বলা যায়, যা তাইসীর তথা সহজীকরণের সম্পূর্ণ বিপরীত।

একটি সাধারণ উদাহরণ

রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনাকে সরকারি ভবনে আমন্ত্রণ জানানো হলো, সবার জন্য সে কী রাজকীয় খাবার-দাবার। কত ধরনের আইটেম তার কোনো ইয়ত্তা নেই। খাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা। ভোজনরসিক হলে তো সোনায় সোহাগা! কিন্তু বিপত্তিটা বাঁধল দস্তরখানে বসার পর। সবার কানে কানে বলা হলো, শুধু চা পানের অনুমতি আছে। এরপর স্বসম্মানে প্রস্থানের দরজা খোলা। নচেৎ.....

এখন আপনিই বলুন, এটাকে কি খাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হলো, বলা যাবে? কস্মিনকালেও বলা যাবে না। তদ্রূপ কোরআনের এই আয়াতে যেকোনো সূরা পাঠের যে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে যদি কোনো সূরা পাঠকে অত্যাবশ্যকীয় করে দেওয়া হয়, তা কি বহাল থাকে? আইম্মায়ে ছালাছার মতে, সূরা ফাতিহার যেহেতু অনেক বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র গুণ রয়েছে, তাই তা পাঠ করা আমরা ফরয আখ্যা দিয়েছি। সাথে সাথে রাসূল (সা.) সর্বদা সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আমরা বলি, হাদীস শরীফে যেখানেই সূরা ফাতিহার কথা বলা হয়েছে সাথে সাথে مـــــازاد তথা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মেলানোর কথা বিবৃত হয়েছে। তাহলে তারা হাদীসের এক অংশের ওপর আমল করছে আর আমরা পুরো হাদীসের ওপর আমল করছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের আমল সম্পূর্ণ কোরআন মতে হচ্ছে। কোরআনে সূরা পাঠের যে ব্যাপকতা فـاقـرءوا مـا تيسر من القرآن থেকে অনুমিত হয়, আমরা সেটাকে সীমাবদ্ধ করছি না। আর স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অনেক পরেই হাদীস শরীফের অবস্থান। সুতরাং সূরা ফাতিহা পাঠের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের পুনর্বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন এবং অনর্থক।

আমরা মনে করি, আইম্মায়ে ছালাছা সূরা ফাতিহা ফরয হওয়ার ব্যাপারে যেসব আয়াত উপস্থাপন করে থাকেন সেগুলো লা-মাযহাবীদেরও দলিল। এই ধারণাটি মারাত্মক ভুল। লা-মাযহাবীরা যদি এসব দলিল উপস্থাপন করে থাকে সাথে সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে বলতে হবে, এসব দলিলের মাধ্যমে আইম্মায়ে ছালাছা সূরা ফাতিহা ফরয হওয়াকে প্রমাণিত করেছেন। শুধু কেরাত ফরয হওয়াকে নয়। তোমাদের আর তাদের দাবি ভিন্ন হওয়ায় তাদের দলিল উপস্থাপনের ন্যূনতম অধিকারও তোমাদের নেই।

সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের অবস্থান

সর্বপ্রথম তোমরা সূরা ফাতিহা সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান এবং দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করো। খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে লা-মাযহাবীদের অবস্থান সর্বতোভাবে আইম্মায়ে ছালাছার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে আইম্মায়ে ছালাছার কয়েকটি মত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যে মতটি সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় তা হলো, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। স্মর্তব্য যে, এটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জদীদ কওল (নতুন মত)। আপনারা উসুলে ফিকাহ সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। আপনাদের জানা থাকার কথা, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, সুন্নাত এবং ফরযের মাঝখানে অন্য কোনো স্তর নেই। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নীতি মতে, যদি ফরয এবং সুন্নাতের মাঝখানে ওয়াজিবের স্তর থাকত, তাহলে তিনি কখনো সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয বলতেন না, বরং ওয়াজিবই বলতেন। আমি যে বলছি, তাদের মাযহাবে ওয়াজিবের স্তর থাকলে তিনি সেটিকে ওয়াজিব আখ্যা দিতেন, ফরয আখ্যা দিতেন না, এটি কোনো মৌখিক দাবি নয়, বরং প্রমাণভিত্তিক দাবি।

একটি সূক্ষ্ম মাসআলা

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অনুসারী পরবর্তী আলেমদের মাঝে এ বিষয়টি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি যে, কেউ যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় কোনো তাশদীদ, অথবা অন্য কোনো ভুল করে বসে, তাহলে তার নামাযের ব্যাপারে বিধান কী? ইমাম শাফেয়ী (রহ.)সহ অনেক অনুসারীর অভিমত হচ্ছে, তার নামায ওয়াজিবুল ই'আদা তথা পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। যেহেতু তার ফরজে ত্রুটি রয়ে গেছে; কিন্তু অনেকের মতে, তার দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না, বরং যদি সে فـاقـرءوا مـا تيسر من الـقـرآن এর পরিমাণ পড়ে নেয়, তাহলে তার নামায পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলাফল কী হলো? শুধু কেরাত পড়াটাই ফরয, সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয নয়, হানাফীদের মতের সাথে শাফেয়ী ইমামরাও একাত্মতা পোষণ করলেন।

আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার

দেখা গেল, শেষমেষ আমাদের আর তাদের মাঝে সূরা ফাতিহা নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মতভেদই নেই। যদিও থাকে, সেটা সম্পূর্ণই আমরা মুকাল্লিদদের ঘরোয়া ব্যাপার। এখানে লা-মাযহাবীদের নাক গলানোর অথবা স্বার্থ উদ্ধারের কোনো সুযোগ নেই। যদি তারা নাক গলানো অথবা স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়ে থাকে, তাহলে সেটা আমাদেরই অসচেতনতা এবং ব্যর্থতা।

পুনরায় উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

সর্বপ্রথম লা-মাযহাবীদের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি নিয়ে নিতে হবে যে, তাদের মতে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করার শরয়ী বিধান কী? প্রথমে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করছি। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা বৈধ নয়। আমাদের ফিকাহর গ্রন্থসমূহে এ ব্যাপারে সবচেয়ে কঠিন যে মতটি পাওয়া যায়, তা হলো মাকরূহে

তাহরীমী তথা হারামের নিকটবর্তী। এর ব্যাপারে এত কঠোরতার কারণ হচ্ছে, এখানে পবিত্র কোরআনের সাথে সংঘর্ষ হয়ে যায়।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর মত

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) ইরশাদ করেন–

یہاں منازعت سے منازعت ظاہری نہیں بلکہ منازعت حقیقی مراد ہے

এখানে পবিত্র কোরআনের সাথে সংঘর্ষ হওয়ার অর্থ বাহ্যদৃষ্টিতে সংঘর্ষ নয়, বরং বাস্তবিক অর্থে সংঘর্ষ হওয়া উদ্দেশ্য, নামাযে ইমাম সাহেব কেরাত উচ্চস্বরে পড়ুক অথবা নিম্নস্বরে পড়ুক। কারণ রাসূল (সা.) কোনো শর্ত ছাড়াই খেদ প্রকাশ করেছিলেন, مالی انازع القرآن আমার পেছনে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কেন আমার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছো?

রাসূল (সা.)-এর এত কঠোর ভাষায় নিষেধ করার কারণেই হানাফী আলেমদের এক দলের মত হচ্ছে, ইমামের পেছনে কেরাত পড়া মাকরূহে তাহরীমী। আসলে এ বিষয়ে আমাদের হানাফী মাযহাবে কয়েকটি মত পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে লা-মাযহাবীদের বিষয়ে আলোচনার সময় পাওয়া যাবে না। বিধায় আমি সেদিকে যাব না।

লা-মাযহাবীদের আসল মাযহাব হচ্ছে, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। চাই একাকী নামায পড়ুক অথবা ইমামের পেছনে পড়ুক। এমনকি জানাযার নামাযেও তাদের মতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। স্মরণ রাখবেন, ফরয প্রমাণিত হওয়ার জন্য দলিল قطعی الثبوت وقطعی الدلالة (অর্থাৎ প্রমাণগত দিক দিয়েও অকাট্য এবং অর্থগত দিক দিয়েও অকাট্য) হওয়া জরুরি। তাই ফরয প্রমাণিত হয়– ১. পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে। ২. মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে। মারফু হাদীসও ফরয প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

লা-মাযহাবীদের দলিল

ফরয প্রমাণিত হওয়ার জন্য কোনো ধরনের দলিল প্রয়োজন আর লা-মাযহাবীরা কোন ধরনের দলিল উপস্থাপন করছে দেখুন! (শুভঙ্করের ফাঁকি!) তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল এটি,

قسمت الصلاة بینی وبین عبد ی نصفین

এই হাদীসে সূরা ফাতিহাকে সালাত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর অন্য হাদীসে আছে,

لاصلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب

অর্থ: যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না। (সহীহ মুসলিম ১/১৬৯)

সুতরাং যে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামাযই হবে না। প্রথম হাদীসে সূরা ফাতিহাকে নামায হিসেবে আখ্যা দেওয়ার রহস্য এই যে নামাযের মূলই হচ্ছে সূরা ফাতিহা। সুতরাং সূরা ফাতিহা না পড়লে নামাযই হবে না। এটি লা-মাযহাবীদের আবিষ্কার যে, তারা একটি হাদীসকে সামনে রেখে সূরা ফাতিহাকে নামায আখ্যা দিচ্ছে। এই দাবির অসারতা প্রমাণে এত বেশি ব্যতিব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। কারণ এটি কোনো নতুন তথ্য নয়। বরং পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় কোরআন পাঠকে নামায আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শুধু কি তাই, বরং এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলোকে পুরো নামায হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আপনারা সবাই আলেম, এসব বিষয়ের প্রতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে যদি আপনারা অধ্যয়ন করেন তাহলে অনেক লম্বা-চওড়া জ্ঞানগর্ভ আলোচনাই আপনারা পাবেন। আমি কিন্তু সেসব বিষয়ে আলোচনা করব না। বরং আমি জনসাধারণের বোঝার সহজার্থে কয়েকটি কথা বলব। আপনারাও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

লা-মাযহাবীরা এ বিষয়ে সর্বপ্রথম তড়িঘড়ি করে বুখারী শরীফের এই বর্ণনাটি পেশ করে থাকেন–

لاصلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب

যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামাযই হবে না। আমরা তাদের কাছে জানতে চাই। এই হাদীস শরীফে মুক্তাদী কোন শব্দের অনুবাদ?

অর্থাৎ এই হাদীস থেকে তোমরা প্রমাণ করো যে, মুক্তাদী সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। এই হাদীসের কোন শব্দের অনুবাদ মুক্তাদী করলে? দেখুন এখানে لا অর্থ, না। صلاة অর্থ নামায। لمن অর্থ, নামাযী ব্যক্তি। لم فاتحة الکتاب অর্থ , পড়বে না। یقرأ অর্থ সূরা ফাতিহা। পুরো অর্থ কী দাঁড়াল? যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না। এখানে মুক্তাদীর কথা এল কোথা থেকে? তারা শঠতা করে বলবে, এখানে من অর্থ, মুক্তাদী। কারণ من যেহেতু ব্যাপক, তাই ইমাম মুক্তাদী সবাইকে পরিব্যাপৃত করবে। আপনি তখন বলবেন, যদি কোনো বিষয় ইজতিহাদ এবং কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তা ফরয হতে পারে না।

আমাদের দলিল

আমরা বলি, মুক্তাদী ইমামের পেছনে কেরাত পড়বে না। কারণ মুসলিম শরীফে আছে–

انما جعل الامام لیوتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، قال له ابوبکر فحدیث ابی هریرة فقال هو صحیح یعنی واذا قرآ فانصتوا فقال هو عندی صحیح

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, জামা'আতের নামাযে ইমাম হলো অনুসরণের জন্য। অতএব ইমাম যখন আল্লাহু আকবর বলেন তখন তোমরাও আল্লাহু আকবর বলবে। আর ইমাম যখন পাঠ করেন তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য আবু বকর (রহ.) এই হাদীস সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম মুসলিম বললেন, আমার মতে হাদীসটি সহীহ। (সহীহ মুসলিম ১/১৭৪)

মুসলিম শরীফের ব্যতিক্রমধর্মী জায়গা

ইমাম মুসলিম (রহ.) পুরো মুসলিম শরীফে কোন হাদীস সহীহ আর কোন হাদীস দুর্বল, তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি। কিন্তু মুসলিম শরীফে শুধু এই জায়গায় এসে তার ব্যতিক্রম হয়েছে। ইমাম মুসলিম (রহ.) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন– هو عندى صحيح আমার মতে হাদীসটি সহীহ। এখানে فانصتوا শব্দটি আমর বা আদেশসূচক বাক্য। আর আমর দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ।

পবিত্র কোরআনের আরেকটি আয়াত দেখুন–

واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

যখন কোরআন পড়া হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (সূরা আরাফ-২০৪)

লা-মাযহাবীরা বলে থাকে, এই আয়াতটি ব্যাপক হলেও لا صلاة الا بفاتحة الكتاب এই হাদীসটি সূরা ফাতিহাকে ওই ব্যাপকতা থেকে খাস করে দিচ্ছে। সূরা ফাতিহা পড়লে তা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কেননা খাস আমের ওপর অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। আফসোস, শত আফসোস! লা-মাযহাবীরা স্বীকারও করে থাকে, সাথে সাথে তাদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে। আমাদের উসুলুশ শাসীতেও আছে, খাসের ওপর আমল করা যেমন ওয়াজিব, তদ্রূপ আমের ওপরও আমল করা ওয়াজিব। তবে عام مخصوص منه البعض-র ক্ষেত্রে বিধান কিছুটা পরিবর্তন হয়। তাই সমস্ত মুফাসসিরীনের বক্তব্য হচ্ছে, ইমাম যখন নামাযে কোরআন তেলাওয়াত করবেন তখন মুক্তাদী নিশ্চুপ থাকবে।

লা-মাযহাবীদের ধূর্তামি

সূরা আরাফের এই আয়াতটি লা-মাযহাবীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক চেষ্টা করেও এই আয়াতের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে তারা শেষ তীর নিক্ষেপ করে এই বলে যে, প্রখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, এই আয়াত খুতবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা বলি, হযরত মুজাহিদ (রহ.) না আল্লাহ, না আল্লাহর রাসূল! তোমাদের মতে, এই দুই উৎস ছাড়া দলিল দেওয়া যায় না। সুতরাং মুজাহিদের বক্তব্য দিয়ে দলিল উপস্থাপন করতে একটু হলেও লজ্জা করা দরকার! ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ প্রখ্যাত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন–

اجمع الناس على ان هذه الآية فى الصلاة

এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে যে এই আয়াত নামায সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (আল মুগনী ১/৪৯০)

ইমাম যায়েদ ইবনে আসলাম ও আবুল আলিয়া (রহ.) বলেছেন–

كانوا يقرءون خلف الامام فنزلت واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

অর্থ : কিছু মানুষ ইমামের পেছনে কেরাত পড়তেন। তখন এই বিধান অবতীর্ণ হয়, যখন কোরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে। (আল মুগনী ১/৪৯০)

আমল হতে হবে পুরো হাদীসের ওপর

হাদীসের ওপর অবশ্যই আমল করতে হবে। তবে তা পূর্ণাঙ্গ হাদীসের ওপর। অর্ধেক হাদীসের ওপর নয়। লা-মাযহাবীরা বুখারী শরীফের বরাত দিয়ে হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করে থাকে, একই হাদীস ইমাম মুসলিম (রহ.)ও বর্ণনা করেছেন। তাও হযরত উবাদা (রা.)-এর সূত্রে। সেখানে আছে, لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا অর্থাৎ সূরা ফাতিহা এবং আরো কিছু বেশি কেরাত না পড়লে নামায হবে না। জনসাধারণকে এ কথা বলে বোঝাতে হবে, এই লা-মাযহাবী মাওলানারা অর্ধেক হাদীস বর্ণনা করে আপনাদেরকে ধোঁকায় ফেলতে চায়। আর আমরা রাসূল (সা.)-এর পুরো হাদীসই বর্ণনা করছি। শুধু এটা নয়, বরং আরও ৭-৮টি হাদীস শরীফে مـــــازاد অথবা ماتيسر এ শব্দগুলো আছে।

একটি সহজ নকশা দেখুন

বুখারী শরীফে হযরত উবাদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে,

لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

একই হাদীস একই সূত্রে একই সাহাবীর বরাতে মুসলিম শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدا

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

قال كنا نتحدث انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد

একই গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে–

لاتجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا

মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

امرنا نبينا عليه السلام ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر

জনসাধারণকে এভাবে বোঝাতে হবে, তাদের আমল অর্ধেক হাদীসের ওপর, আর আমাদের আমল আলহামদুলিল্লাহ পূর্ণাঙ্গ হাদীসের ওপর। আর লা-মাযহাবীরা বুখারী শরীফের যে হাদীস দিয়ে থাকে, সেখানে মুক্তাদীর কোনো আলোচনাই নেই। তারা এমন হাদীস উপস্থাপন করুক, যেখানে মুক্তাদীকে জেহরী এবং ছিররি (উচ্চস্বরে এবং নিম্নস্বরে কেরাত) উভয় ধরনের নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে যে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা ছেড়ে দেবে তার নামায

আদায় হবে না–এ রকম কোনো দলিল দেখাতে বলুন।

লা-মাযহাবীদের আবার অপকৌশল

লা-মাযহাবীরা واذا قرأ القرآن فاستمعوا له এই আয়াতের কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পেরে বলতে লাগল, তাহলে ছিররি নামাযে (যে নামাযে নিম্নস্বরে কেরাত পাঠ করা হয়) মুক্তাদীরা ইমামের পেছনে নামায পড়বে। তাদের এই কথার উত্তরে আমরা প্রখ্যাত তাফসীরবেত্তা ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যে তাৎপর্যময় মন্তব্য করেছেন, তা উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন–

دلت الآية على النهى عن القرأة خلف الامام فيما يجهر به فهى دالة على النهى فيما يخفى، لانه اوجب الاستماع والانصات عند قراءة القرآن، ولم يشترط فيه حال الجهر من الاخفاء فاذا جهر فعلينا الاستماع والانصات واذا اخفى فعلينا الانصات بحكم اللفظ لعلمنا بانه قارئ للقرآن

অর্থ : উপরোক্ত আয়াতে যেমন জোরে কেরাতের নামাযে মুক্তাদীকে কেরাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি আস্তে কেরাতের নামাযেও। কেননা এ আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতের সময় নিশ্চুপ থাকা ও শ্রবণ করার আদেশ করা হয়েছে। জোরে কেরাতের নামায এবং আস্তে কেরাতের নামাযে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অতএব ইমাম যখন জোরে কোরআন পড়েন তখন যেমন চুপ থাকা ও মনোযোগ দিয়ে কেরাত শোনা জরুরি, তেমনি যখন আস্তে কোরআন পড়েন তখনও চুপ থাকা জরুরি। কেননা, আমরা জানি যে ইমাম সাহেব কোরআন পড়ছেন। (আহকামুল কোরআন ৩/৩৯)

রুকুতে রাক'আত প্রাপ্তি

লা-মাযহাবীদের গোমর ফাঁস করার জন্য জনসাধারণকে এই কথা বোঝান যে কোনো ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকুতে পায় এবং সে তখনই নিয়্যত বাঁধে, তাহলে সে ওই রাক'আত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। অথচ সে সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগই পায়নি। দেখুন বুখারী শরীফের হাদীস–

عن ابى بكرة انه انتهى الى النبى ﷺ وهو راكع فركع قبل ان يصلى الى الصف فذكر ذلك للنبى عليه السلام فقال زادك الله حرصا ولا تعد

হযরত আবু বাকরা (রা.) জামা'আতের নামাযে এসে দেখলেন যে, নবী (সা.) রুকুতে চলে গেছেন। তিনি তখন কাতারে না পৌঁছেই রুকুতে শামিল হলেন। নামাযান্তে বিষয়টি নবী (সা.) কে জানানো হলো। তিনি আবু বাকরা (রা.) কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন, তবে এমন আর করো না। অর্থাৎ কাতারে পৌঁছার আগে নামায শুরু করো না। (সহীহ বুখারী ১/১০৮)

হাফেয ইবনে হাজর (রহ.) এই হাদীসের টিকায় লেখেন, ইমাম তাবারানী হযরত হাসান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে নামাযান্তে রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কে করেছে? আবু বাকরা (রা.) প্রত্যুত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন করেছি, যেন আপনার সঙ্গে আমার এই রাক'আত ছুটে না যায়। (ফতহুল বারী)

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে, রাসূল (সা.) আবু বাকরাকে তাঁর পবিত্র প্রেরণার জন্য সাধুবাদ দিয়েছেন এবং তার জন্য দু'আ করেছেন, সাথে সাথে কাতারে পৌঁছার পূর্বে নামাযে শামিল হওয়ার ভুল কাজটিও সংশোধন করে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে হযরত আবু বাকরা (রা.) সূরা ফাতিহা না পড়া সত্ত্বেও রাসূল (সা.) তাকে পুনরায় নামায পড়তে বলেননি। অথচ লা-মাযহাবীদের কথা অনুযায়ী, সূরা ফাতিহা না পড়ায় তার নামাযই শুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। এ থেকেও বোঝা যায়, মুক্তাদীর জন্য ইমামের পেছনে কেরাত পড়া জরুরি নয় বরং সম্পূর্ণভাবে নিষেধ।

রাসূল (সা.) মুক্তাদী হয়ে সূরা ফাতিহা পড়েননি

জনসাধারণকে এই ঘটনাও বলতে পারেন, রাসূল (সা.) যখন শেষ বয়সে অসুস্থতার দরুন মসজিদে আসতে অক্ষম হয়ে পড়েন তখন হযরত আবু বকর (রা.) কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। রাসূল (সা.) যখন একটু সুস্থতা অনুভব করেন তখন দুজন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে উপস্থিত হন। রাসূল (সা.) মসজিদে উপস্থিত হলে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) পেছনে সরে আসেন। রাসূল (সা.) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) যেখানে কেরাত সমাপ্ত করেছিলেন, সেখান থেকেই কেরাত পড়া আরম্ভ করেন। দেখুন লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ। আর হযরত আবু বকর (রা.) যখন রাসূল (সা.) কে ইমাম বানিয়ে নিজে মুক্তাদী হয়ে যান তখন তিনিও সূরা ফাতিহা আর পাঠ করেননি।

রাসূল (সা.)-এর সূরা ফাতিহাবিহীন নামায আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর সূরা ফাতিহাবিহীন নামায সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের বক্তব্য কী? তাঁদের নামায হয়নি? হলে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ব্যতিরেকে কিভাবে হলো? এই ঘটনার আদ্যোপান্ত মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে বিবৃত হয়েছে। এই কথাগুলো জনসাধারণ বুঝে গেলে তারা পালানোর পথও খুঁজে পাবে না ইনশাআল্লাহ।

কথাটি এভাবেও বোঝাতে পারেন

জনসাধারণের সামনে কথাটি এভাবে স্পষ্ট করতে পারেন। আযান দেওয়া নামাযের সুন্নাত। কিন্তু আযান কি সবাই দেবে? না বরং একজন আযান দিলে সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। ইকামত সবার পক্ষ থেকে একজন দিলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। জুমু'আর খুতবা খতীব সাহেব দিয়ে দিলে সবার

পক্ষ থেকেই আদায় হয়ে যাবে। তদ্রূপ নামাযের কেরাতও কেবল ইমাম সাহেব পাঠ করলে মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

কয়েকটি হাদীস শরীফে দেখুন

ইমাম সাহেব পাঠ করলে মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে–এটি কিন্তু আমাদের কথা নয়। বরং ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী শরীফ ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة

যে ইমামের পেছনে নামায আদায় করবে তার জন্য ইমামের কেরাতই যথেষ্ট। (এতহাফুল খিয়ারাতিল মাহরাহ ২/২১৬ হা. ১৮৩২)

ইবনে উমর (রা.) এই ফতোয়া দিতেন যে,

من صلى وراء الامام كفاه قراء ة الامام

ইমামের পেছনে নামায আদায়কারীর জন্য ইমামের কেরাতই যথেষ্ট। ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, ইবনে উমর (রা.)-এর মতটিই বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত (সুনানে বায়হাকী ২/১৬১)

হযরত নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وكان عبد الله بن عمر لايقرأ خلف الامام

হযরত ইবনে উমর (রা.) ইমামের পেছনে কেরাত পড়তেন না। (মুআত্তা মালেক, পৃ. ২৯) আল্লামা নিমভী (রহ.) আসারুস সুনান গ্রন্থে (১/৮৯) এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

সূরা ফাতিহা কি কোরআন শরীফের অন্তর্ভুক্ত নয়?

সূরা ফাতিহা কি কোরআন শরীফের অন্তর্ভুক্ত নয়? সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে কি কেরাত বলা যাবে না? যদি সূরা ফাতিহা কোরআন মজীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে কোরআন শরীফের ১১৪টি সূরার মধ্যে ১১৩টি সূরা ইমাম পাঠ করলে মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যায়, সূরা ফাতিহার কী এমন অপরাধ, যেটা ইমাম সাহেব পাঠ করলেও মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে না বরং মুক্তাদীদেরকেও পড়তে হবে?

হে আল্লাহ! আমাদের সূরা ফাতিহা কবুল করুন

একটি মজার কথা বলি। আমাদের এলাকায় আমি একটু কৌতুক করে বলে থাকি, শবে কদরে যখন আমরা আল্লাহর দরবারে হাত তুলে মুনাজাত করি হে আল্লাহ! আমাদের খতম তারাবীহ কবুল করুন। আমাদের পুরো কোরআন কবুল করুন। কিন্তু লা-মাযহাবীদেরকে দু'আ এভাবে করতে হবে, হে আল্লাহ আমাদের সূরা ফাতিহা কবুল করুন। কারণ কী? কারণ তারা শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করেছে। আর তাদের ভাষ্য মতে, ইমামের কেরাত মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট না। সুতরাং হে আল্লাহ! আমাদের পুরো কোরআন কবুল করুন, তাদের জন্য এ ধরনের দু'আ করা চরম মিথ্যাচার হবে।

এক রাক'আতে দুই বার আমীন

লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে, মুক্তাদী ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়বে এবং উচ্চস্বরে আমীন বলবে। এখন ধরুন! এক ব্যক্তি ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া আরম্ভ করেছে। তার ফাতিহা শেষ হওয়ার পূর্বেই ইমাম ولا الضالين পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন তখন তার কী করণীয়? তাদের মান্যবর পুরোধা নবাব সিদ্দীক হাসানের মত হচ্ছে, মুক্তাদী তখন উচ্চস্বরে আমীন বলবে। এরপর যখন তার ফাতিহা শেষ হবে, তখন আবার আমীন বলবে। দুই বার আমীন! দুই বার আমীন বলার কথা হাদীস শরীফে কোথায় আছে? অথচ অধিকাংশ সময় হয়তো ইমামের ফাতিহা আগে শেষ হবে অথবা মুক্তাদীর ফাতিহা আগে শেষ হবে। উভয় জনের ফাতিহা একসাথে শেষ হওয়া শুধু বিরল নয় বরং অসম্ভবও বটে।

আমীন জোরে বলবেন না!

ধরুন একজন লা-মাযহাবী যখন ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ হওয়ার পর আমীন বলে আসমান মাথায় তোলে, এরপর যখন তার সূরা ফাতিহা শেষ হয় তখন কেন সে জোরে আমীন বলে ওই সুন্নাতের (!) ওপর আমল করে না?

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর অভিমত

সর্বশেষ ইমামের পেছনে কেরাত পড়া সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের মান্যবর ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি পেশ করে এ বিষয়ের উপসংহার টানব ইনশাআল্লাহ। তিনি লেখেন–

والامر باستماع قراء ة الامام والانصات له مذكور فى القرآن وفى السنة الصحيحة وهو اجماع الامة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم فى الفاتحة وغيرها۔

অর্থাৎ ইমামের কেরাত মনোযোগ দিয়ে শোনা ও নিশ্চুপ থাকার বিধান পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জামা'আতের নামাযে মুক্তাদী সূরা মেলাবে না এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মতে সূরা ফাতিহাও পড়বে না। (তানাওউউল ইবাদত, পৃ. ৫৫)

লা-মাযহাবীদের মহান পুরোধার মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হওয়া তাদের মাথার ওপর ঠাটা পড়ার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। সত্য স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হওয়ার পরও কেন এ গোঁয়ারভাব? দুর্বিনীত ভঙ্গি?

فماذا بعد الحق الا الضلال

সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হওয়া সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা আর কূপমণ্ডুকতা বৈ আর কিছুই নয়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১১

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

বাহাত্তর দল ও মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল

ডা. জাকির নায়েক তাঁর আলোচনায় শুধু চার মাযহাবকেই ভ্রান্ত দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করেননি, বরং তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতকেও ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ডা. জাকির নায়েক বলেছেন,

"See whatever label you give there is bound to be Tafarraqa. When the Shias came people said "Be a Sunni." Again there was group Ahle Sunnah Wal Jamat. Then, again there was division Hanafi, Hanbolii, Shafi, Maleki. Then we came with Salafi, Ahle Hadith..... there is group even in this. The moment the name given by human beings - there is bound to be Tafarraqu.

দেখুন! আপনি মুসলমানদেরকে যে নামই প্রদান করবেন, তা হবে দলাদলি সৃষ্টি। যখন শিয়াদের আবির্ভাব হলো, তখন মুসলমানরা নিজেদেরকে সুন্নি বলেছে। অতঃপর একটা দল সৃষ্টি হয়েছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে। অতঃপর হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আবির্ভাব হয়েছে। এরপর এসেছে ছালাফী, আহলে হাদীস। সুতরাং মুসলমানরা যে নামই প্রদান করবে, তারা তাফার্‌রাকু অর্থাৎ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত হবে।

এভাবে ডা. জাকির নায়েক নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হক দলসমূহকেও ভ্রান্ত ফেরকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH - YouTube http://www.youtube.com/ watch?v =Szzn9lFg9n0)

কিন্তু তিনি হয়তো এতটুকু খেয়াল করেননি যে, রাসূল (সা.)-এর হাদীসে তেহাত্তর দলের কথা বলা হয়েছে এবং তন্মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত একমাত্র দল হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। অথচ ডা. জাকির নায়েক হাদীসটির সঠিক মর্ম উপলব্ধি না করেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে বাতিল বলেছেন।

পৃথিবীর সকল হকপন্থী আলেম এ ব্যাপারে একমত যে তেহাত্তর দলের মাঝে মুক্তিপ্রাপ্ত একমাত্র দল হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত, অর্থাৎ যারা রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ এবং সাহাবাদের জামাতকে অনুসরণ করে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয়

এক.

রাসূল (সা.) বলেছেন,

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم :(ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان منهم من يأتى أمه علانية لكان من أمتى من يصنع ذلك وإن بنى إسرائيل تفرقت اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة) قالوا :من هى يا رسول الله ؟ قال :(ما أنا عليه وأصحابى)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সে সমস্ত জিনিসের আবির্ভাব ঘটবে, যা বনী ইসরাইলের মধ্যে ছিল, দুটি জুতার একটি অপরটির সাথে যেমন মিল রাখে। এমনকি বনী ইসরাইলের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে যিনা করে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যে তা করবে। নিশ্চয় বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের সকলেই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতীত। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা? রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, আমি এবং আমার সাহাবার আদর্শের ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

أخرجه أبو داود فى سننه من حديث معاوية بن أبى سفيان عن النبى صلى الله عليه وسلم :(قال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة وإنه سيخرج من أمتى أقوام تجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله

হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি দল জান্নাতে যাবে। আর তারা হলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দল (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত)। আর আমার উম্মতের মাঝে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের মধ্যে প্রবৃত্তিপূজা এমনভাবে প্রবেশ করবে, যেমন জলাতঙ্ক রোগ, এ রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে। (কিতাবুস সুন্নাহ, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৪৫৯৭, হাদীসটি হাসান)

এ সমস্ত হাদীসে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যারা

রাসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর রাসূল (সা.) এবং সাহাবীদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র দল হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। এ ছাড়া যত সম্প্রদায় তথা রাফেযী, খারেজী, মুরযিয়া, কাদেরিয়া, জাহমিয়া, হারুরিয়া সকলেই ভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্ট।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় সম্পর্কে আল্লামা মায়দানী (রহ.) লিখেছেন–

أهل السنة السيرة و الطريقة المحمدية . و أهل الجماعة :من الصحابة و التابعين و من بعدهم من المتبعين للنبى ﷺ

"আহলুস সুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূল (সা.)-এর সীরাত এবং তাঁর তরীকার ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত এবং আহলুল জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা রাসূল (সা.)-এর অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবেতাবেঈনগণের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" (শরহুল আকিদাতিত তাহাবীয়া, পৃষ্ঠা-৪৪)

"সদরুশ শরিয়া আল্লামা উবাউদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) লিখেছেন–

أهل السنة و الجماعة هم الذين طريقهم طريقة الرسول و أصحابه دون أهل البدع

"যাদের তরীকা হলো, রাসূল (সা.) এবং সাহাবীদের তরীকা, তারাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত এবং তারা কোনো বিদআতী সম্প্রদায় নয়।" (আত-তাউযীহ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের সূরা আলে-ইমরানের ১০৬ নং আয়াতে বলেছেন,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦)

সেদিন (কিয়ামতের দিন) কোনো কোনো মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোনো কোনো মুখ হবে কালো। বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো?।

আল্লামা ইবনে কাসীর পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন–

تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسودّ وجوه أهل البِدْعَة والفرقة

"অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং বিদআতী ও দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে। (আহলুল বিদআ ওয়াল ফুরকা)।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃষ্ঠা-৪২০)

(আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন,

والبدعة مقرونة بالفُرقة، كما أن السُنَّة مقرونة بالجماعة، فيُقال :أهل السُنَّة والجماعة، كما يُقال :أهل البدعة والفُرقة

"বিদআত শব্দটি 'ফুরকা' (বিচ্ছিন্নতাবাদ)-এর সাথে সম্পর্কিত এবং সুন্নাত শব্দটি জামাত (বৃহত্তম) দলের সাথে সম্পর্কিত। যেমন বলা হয়ে থাকে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত এবং বলা হয়, আহলুল বিদআত ওয়াল ফুরকা।" (আল ইস্তিকামাতু ১/৪২)

রাসূল (সা.) যে ভ্রান্ত বাহাত্তর দলের কথা হাদীসে উল্লেখ করেছেন তাদের পরিচয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো–

আল্লামা শাতবী (রহ.) বলেছেন,

"وقال جماعة من العلماء :أصول البدع أربعة، وسائر الثنتين والسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقوا، وهم :الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة

"উলামাদের বড় একটি দল বলেছে, বিদআত ও ভ্রান্তির মূল উৎস হলো চারটি এবং অবশিষ্ট বাহাত্তর দল এ চারটি থেকে সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে। বিভ্রান্ত চারটি দল হলো, খারেজী, রাফেযী, কাদেরিয়া, মুরজিয়া।" (আল ইতিসাম ২/২২০)

আল্লামা কুরতুবী (রহ.)-এর নিকট ভ্রান্ত বাহাত্তর দল–

তেহাত্তর দলে বিভক্তির বিষয়টি আল্লামা কুরতুবী (রহ.) তাফসীরে কুরতুবীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তিনি তৎকালীন যামানা পর্যন্ত আবির্ভূত ছয়টি দলকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছয়টি দলের প্রতিটি দল আবার ১২টি দলে বিভক্ত, অতএব মোট বাহাত্তরটি দল হলো। উল্লিখিত ছয় দল হলো,

১. হারুরিয়া ২. কাদেরিয়া ৩. জাহমিয়া ৪. মুরজিয়া ৫. রাফেজা ও ৬. জাবরিয়া।

(তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪১]

সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট ফেরকা

তাকদীর সম্পর্কে

জাবরিয়া

জাবরিয়া সম্প্রদায় তাকদীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। তাদের আকীদা হলো, বান্দা কিছুই করতে পারে না। বান্দা কোনো কাজ স্বেচ্ছায় করতে অক্ষম। তার নিজস্ব কোনো কার্যকরী ইচ্ছাশক্তি নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা

এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। আমাদের আকীদা হলো, বান্দার ইচ্ছাশক্তি আছে

কিন্তু এটি আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

"আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনো ইচ্ছা করতে পারো না।"

আমাদের আকীদা হলো, বান্দা কাজ করে, কিন্তু বান্দা কাজের স্রষ্টা নয়। আমাদের এবং আমাদের সকল কাজের স্রষ্টা হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.

"তোমাদেরকে এবং তোমরা যা করো, তার সব কিছু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।"

কাদেরিয়া

কাদেরিয়া সাম্প্রদায়ের আকীদা হলো, বান্দা তার নিজের কাজের স্রষ্টা নিজেই। বান্দার কাজের ওপর আল্লাহর কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বান্দাকে হেদায়েতও দিতে পারেন না আবার গোমরাহও করতে পারেন না।

ঈমান ও দ্বীন বিষয়ে

হারুরিয়া

হারুরিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা হলো, কেউ কবিরা গোনাহ করলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং তার রক্ত ও মাল হালাল হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা বৈধ। আর মুতাযেলাদের আকীদা হলো, কবিরা গোনাহ করলে মানুষ ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে, তবে কাফির হবে না। এরা ইমান ও কুফুরীর মাঝে আরেকটি স্তরের কল্পনা করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা

কবিরা গোনাহ করলেও বান্দা ঈমানদার থাকবে। সে ইসলাম ও ঈমান থেকে বের হবে না। তবে সে পরিপূর্ণ মুমিন থাকবে না।

মুরজিয়া এবং জাহমিয়া

এদের আকীদা হলো, কেউ কবিরা গোনাহ করলেও সে পরিপূর্ণ মুমিন থাকবে এবং সে কখনও জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হবে না। ঈমান থাকা অবস্থায় কোনো গোনাহ করলে কিছু হয় না। তাদের মতে আমল না করলেও শুধু মনে মনে বিশ্বাস করাটা যথেষ্ট।

হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে

খারেজী ও নাসেবী সম্প্রদায়

নাসেবী সম্প্রদায় হযরত আলী (রা.) কে ফাসেক বলে এবং খারেজী সম্প্রদায় হযরত আলী (রা.) কাফির বলে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো, হযরত আলী (রা.) সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত চার খলিফার চতুর্থ খলিফা। মর্যাদাগত অবস্থানে অপর তিন খলিফা তাঁর চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন। তবে তিনি অন্য সাহাবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তিনি নবীদের মতো নিষ্পাপ নন।

বার ইমামে বিশ্বাসী শিয়ারা বিশ্বাস করে তিনি নবীদের মতো নিষ্পাপ এবং তিনি রাসূল (সা.) ব্যতীত অন্য সকল নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ।

সাবইয়া সম্প্রদায় হযরত আলীকে খোদা মনে করে।

খাতেমাতুল মুহাক্কিকীন, আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহ.) বলেছেন–

أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة و الماتريدية

"আকীদার ক্ষেত্রে আশআরী এবং মাতুরীদী আকীদা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।"(রদ্দুল মুহতার, ১/৫২)

যুবাইদি (রহ.) বলেন–

إذا أطلق السنة والجماعة فالمراد به الأشاعرة و الماتريدية

"যখন সাধারণভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলা হয়, তখন আশআরী এবং মাতুরীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়।"

(ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তকীন, ২/৬)

অর্থাৎ আকীদার ক্ষেত্রে আশআরী এবং মাতুরীদী আকীদাই হলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আমল তথা ফিকহের ক্ষেত্রে চার মাযহাব হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (রহ.) বলেছেন–

مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم من أهل السنة و الجماعة

"চার ইমাম এবং অন্য ইমামদের মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।"

[উমদাতুল কারী- ২/২৩৭]

মিশকাত শরীফের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেছেন–

مذهب الحنفية من جملة أهل السنة و الجماعة

"হানাফী মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত"

(মিরকাতুল মাফাতেহ, ১৫/৩২১)

এটি সর্বজনবিদিত যে, কোনো মাযহাবই ভ্রান্ত বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক কিভাবে যে এই ধ্রুব সত্য বিষয়টিকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করেন, তা আমাদের নিকট অস্পষ্ট।

তিনি অবলীলায় সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করেছেন। হক ও বাতিলকে একাকার করে দিয়েছেন। অথচ পবিত্র কোরআনের ইরশাদ হলো,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করো না।" [সূরা বাকারা, আয়াত নং ৪২]

ডা. জাকির নায়েক যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী না হন, তবে তিনি কোন আকীদায় বিশ্বাসী, সেটা আমাদের নিকট অস্পষ্ট।

বাহাত্তর দল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন–

The Prophet had said that there would be 73 sects.

Some may argue by quoting the Hadith of our beloved Prophet, from Sunan Abu Dawood Hadith No. 4579. In this Hadith the Prophet (pbuh) is reported to have said, "My community will split up into seventy-three sects."

This hadith reports that the prophet predicted the emergence of seventy-three sects. He did not say that Muslims should be active in dividing themselves into sects. The Glorious Qur'an commands us not to create sects. Those who follow the teachings of the Qur'an and Sahih Hadith, and do not create sects are the people who are on the true path.

According to Tirmidhi Hadith No. 171, the prophet (pbuh) is reported to have said, "My Ummah will be fragmented into seventy three sects, and all of them will be in Hell fire except one sect." The companions asked Allah's messenger which group that would be. Where upon he replied, "It is the one to which I and my companions belong".

The Glorious Qur'an mentions in several verses, "Obey Allah and obey His Messenger". A true Muslim should only follow the Glorious Qur'an and the Sahih Hadith.

"আমাদের নবীজি (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে তেহাত্তর দল হবে।"

কেউ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বিতর্ক করতে পারে। হাদীস নং ৪৫৭৯। এ হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মত তেহাত্তর দলে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই হাদীসে রাসূল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তেহাত্তর দল হবে। তিনি এ কথা বলেননি যে, মুসলমানদেরকে সক্রিয় হয়ে তেহাত্তর দল সৃষ্টি করতে হবে। কোরআনে দলাদলি সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে এবং যারা দলাদলি সৃষ্টি করে না, তারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে। তিরমিযী শরীফের ১৭১ নং হাদীস অনুযায়ী, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের সকলেই জাহান্নামে নিপতিত হবে, মাত্র একদল ব্যতীত। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, কোন দলটি জান্নাতে যাবে? তখন রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন,

"It is the one to which I and my companions belong".

"আমি এবং আমার সাহাবাদের পথে যারা চলবে, সেই দল।"

কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করো। একজন সত্যিকারের মুসলমান শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস মানতে পারেন।"

(http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199)

এখানে ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাবসহ সালাফী, আহলে হাদীস সবগুলোকে তেহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ তিনি এতটুকু খেয়াল করেননি যে মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে, অবশিষ্ট বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর সব মানুষ কি জাহান্নামে যাবে? পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করে থাকে। আর কিছু লোক আছে, যারা সালাফী। এরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। কেউ আহলে হাদীস, কোথাও লা-মাযহাবী। সুতরাং সবাই যদি বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দল কোনটি? ডা. জাকির নায়েক? তিনি কি একাই জান্নাতে যেতে চান? সারা পৃথিবীর সবাইকে জাহান্নামী বানিয়ে তিনি একাই জান্নাতে যেতে চান?

দীর্ঘ ১২-১৩ শত বছর সারা পৃথিবীর সব মানুষ চার মাযহাব অনুসরণ করেছে। তবে তারাও কি জাহান্নামী? যেহেতু জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে 'মুসলমান' বাদে যেকোনো লেবেল লাগালেই সেটা দলাদলির অন্তর্ভুক্ত এবং এরা তেহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত হবে, অতএব তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ১২-১৩ শত বছরের সকল মুসলমান জাহান্নামী।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

বিজ্ঞ পাঠক! ডা. জাকির নায়েক তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের তেহাত্তর দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একটিমাত্র দল জান্নাতে যাবে। বাকি বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেছেন, জান্নাতী দল কোনটি। রাসূল (সা.) উত্তর দিয়েছেন,

"It is the one to which I and my companions belong".
যে দলটি আমি এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।
হাদীসের এ বক্তব্যের সাথে এবং ডা. জাকির নায়েকের নিচের বক্তব্যটি একটু মিলিয়ে দেখুন!
Those who follow the teachings of the Qur'an and Sahih Hadith, and do not create sects are the people who are on the true path.
'যারা শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে এবং কোনো বিভক্তি সৃষ্টি করে না, তারা হলো সত্য পথপ্রাপ্ত।'
রাসূল (সা.) বলেছেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের অনুসরণ করবে। অথচ ডা. জাকির নায়েক সাহাবীদের আদর্শ বাদ দিয়ে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের সার্টিফিকেট তাদেরকে দিয়েছেন, যারা কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করবে। এখানে তিনি সাহাবীদের অনুসরণের বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন কেন? রাসূল (সা.) যেখানে বলেছেন, যে দলটি আমার এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর চলবে। এখানে ডা. জাকির নায়েক বলছেন, শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস মানলেই 'ট্রু মুসলিম' হয়ে যাবে। রাসূল (সা.) তো তা বলেননি। তিনি বলেছেন, আমার আদর্শ তথা কোরআন ও সুন্নাহ এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর যারা চলবে। তিনি এখানে সাহাবীদের আদর্শ অনুসরণের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।
ডা. জাকির নায়েক শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে বলেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে বলেছেন,
'তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো, অনুসরণ করো আল্লাহর রাসূলের এবং তোমাদর মধ্যে যারা 'উলুল আমর' তথা আলেম বা শাসক রয়েছেন, তাঁদের অনুসরণ করো।
কোরআনে তো শুধু এ কথা বলা হয়নি যে,
A true Muslim should only follow the Glorious Qur'an and the Sahih Hadith.
'সত্যিকার মুসলিম শুধু (only) কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করবে।'
ডা. জাকির নায়েক কোরআনের এ আয়াতের ক্ষেত্রে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আয়াতের প্রথম অংশ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আয়াতের যে অংশে শাসক বা আলেমগণের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে, সেটি এড়িয়ে গেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এসব কোরআন ও ইসলামের স্পষ্ট অপব্যাখ্যা।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : কমিশন

মুহা. মিজানুর রহমান
টঙ্গী হিয়ারিং এইড সেন্টার, টঙ্গী, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমরা হিয়ারিং এইডের ব্যবসা করি অর্থাৎ মানুষ কানে কম শুনলে অথবা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে আমরা কানের পরীক্ষা করি এবং কানে কম শোনার মেশিন বিক্রয় করি। আমাদের এই ব্যবসায় সাধারণত নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে সম্পর্ক। স্যার আমাদের কাছে রোগী পাঠাবেন। তখন ডাক্তারগণ আমাদের সাথে চুক্তি করেন, আমাকে কত পার্সেন্ট দেবেন? অমুক সেন্টার আমাকে ৬০% দেয়। তখন আমাদের বাধ্য হয়ে বলতে হয় স্যার, তাহলে আমরা ৭০% অথবা ৮০% দেব। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপহারসামগ্রীও প্রদান করে থাকি। ব্যবসার খাতিরে আমাদের মন না চাইলেও এই কমিশন দিতে আমরা বাধ্য। আবার কোনো কোনো খোদাভীরু ডাক্তার এমনও আছেন যাঁরা বলেন, আমাকে যে কমিশন দেবেন, সেটা না দিয়ে রোগীর কাছ থেকে ওই পরিমাণ টাকা কম নেবেন। জানার বিষয় হলো, ডাক্তারদের সাথে এমন লেনদেন কতটুকু শরীয়তসম্মত।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে ডাক্তারদের কমিশন দেওয়া ও নেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত না হওয়ায় তা বর্জনীয়। (সুনানু আবী দাউদ ২/৫০৪)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহা. রাকিব হাসান
সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমার একজন ছাত্রভাই আপসের মধ্যে মহিলা মাদরাসা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে একপর্যায়ে সে বলে ফেলল, আমি যদি মহিলা মাদরাসার কোনো ছাত্রীকে বিয়ে করি তাহলে সে তালাক অথবা বিয়ের পর যদি জানতে পারি যে সে মহিলা মাদরাসার ছাত্রী তাহলে তালাক। এখন আমার জানার বিষয় হলো, ওই ব্যক্তির বিবাহের শরয়ী বিধান কী?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে মহিলা মাদরাসার ছাত্রীকে বিবাহ করলে, তালাকে-বাইন হয়ে যাবে এবং তালাকের পর নতুন করে বিবাহ করতে পারবে। আর তালাক থেকে বাঁচার জন্য মহিলা মাদরাসা ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিবাহ করতে পারেন। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪২০)

প্রসঙ্গ : তদবির

মুহা. হাবিবুর রহমান
দিনাজপুরী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের বাড়ির আমগাছে যখন পোকা লেগেছিল তখন আমার দাদি তিনজন অথবা পাঁচজন সুদি ব্যক্তির নাম লিখে আমগাছে ঝুলিয়ে দিলেন। এর পরদিন দেখা গেল গাছে আর কোনো পোকা নেই এবং গাছে অনেক আমও ধরেছে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, সুদি ব্যক্তির নাম দ্বারা ফায়দা হাসিল করা জায়েয আছে কি না?

সমাধান :

গাছের পোকা দূর করতে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তি নেই। যদি এটাকে প্রকৃত প্রতিরোধক মনে করা না হয়। বিধায় আমগুলো খেতে অহেতুক সংশয়ের কোনো কারণ নেই। (সূরা শুরা-৪৯, বুখারী ১/১৩৭)

প্রসঙ্গ : হজ

মুহা. মুঈনুল ইসলাম
চান্দিনা, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তি সার্বিকভাবে দ্বীনদার ও সম্ভ্রান্ত। পরিবারের সবাই দ্বীন-ধর্ম বিশেষত পর্দা-পুশিদার ব্যাপারে খুবই সচেতন। যার একটি দৃষ্টান্ত হলো, তার বাবা সরকারি চাকরি করতেন। তাই বাবার মৃত্যুর পর মা পেনশনের হকদার ছিলেন। কিন্তু এর জন্য যেহেতু ফটো জমা দিতে হয় তাই তিনি এ পেনশন নেননি। বর্তমানে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর হজ ফরজ হয়েছে। হজে যেতে হলে আইডি কার্ড ও পাসপোর্ট করতে হবে। এগুলোতে ফটো অত্যাবশ্যক। ফটো যদিও কোনো মহিলার মাধ্যমে তোলা সম্ভব হবে কিন্তু পাসপোর্টের ফটো অনেক পরপুরুষের নজরে পড়বে। বিশেষ করে জেদ্দায় পাসপোর্টের ফটো দেখিয়ে তার বাহককে তালাশ করা হয়। তা ছাড়া সফরে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার অনেক ভক্ত-অনুরক্ত ও পরিচিতজন থাকে। তাদের সামনে নিজ স্ত্রীর ফটো

প্রদর্শিত হলে তার জন্য এবং তার স্ত্রীর জন্য অসহনীয় ও অবর্ণনীয় মনোকষ্টের কারণ হবে। তার মনে হচ্ছে যেন সারা জীবনের অর্জন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে মাননীয় মুফতী সাহেবের খেদমতে আরজ এই যে, এসব বিবেচনায় উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য নিজে হজে না গিয়ে বদলি হজ করানোর সুযোগ আছে কি না?

সমাধান :

যদি সরকার এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার ব্যাপারে অথবা যেকোনো ব্যাপারে নারী হোক বা পুরুষ হোক ছবি তোলা বাধ্যতামূলক করে দেয় তখন প্রয়োজনে ছবি তোলার অনুমতি আছে। যদি কোনো মুসলমানের ওপর হজ ফরজ হয়, তার জন্য ফটো তুলে হজে যাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু যদি কোনো মুসলমান ফটো তুলে হজে যেতে অনিচ্ছুক হয়, সে ক্ষেত্রে তার জন্য ফটো তোলা জরুরি নয়। সে ফটোবিহীন হজ করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করতে থাকবে এবং চেষ্টা-তদবির করতে থাকবে। তাতে কোনো সফলতা না এলে সে ক্ষেত্রে বদলি হজ করার জন্য অসিয়ত করে যাবে। (সূরা আহযাব-৫৩, বাদায়িউস সানায়ে ৩/২৭৩)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা. আকরাম হুসাইন
রাজৈর, মাদারীপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মহল্লার ইমাম সাহেব নামাযের পূর্বে মুখে গুল দিয়ে নামায পড়ান। এমতাবস্থায় নামাযের হুকুম কী? এবং তাঁর পেছনে ইক্তিদা সহীহ হবে কি না?

সমাধান :

যেহেতু গুলের অংশ নামাযরত অবস্থায় লালার সাথে মিশে গলার ভেতর চলে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল, তাই উক্ত ইমামের পেছনে নামায শুদ্ধ বলা যাবে না। এ অভ্যাস পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁকে ইমামতি থেকে বিরত রাখা জরুরি। (ফাতাওয়া শামী ১/৬২৩)

প্রসঙ্গ : ইমামতি

হাফেজ আনোয়ার হুসাইন
শ্রীনগর, ভৈরব।

জিজ্ঞাসা :

আমি মাদরাসার একজন শিক্ষক ও একটি জামে মসজিদের ইমাম। কয়েক বছর আগে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আমার পিঠ বাঁকা হয়ে যায়। এখন আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম। এই কারণে বর্তমানে কিছু মুসল্লি বলাবলি করে যে আমার পেছনে নামায পড়লে নাকি তা শুদ্ধ হবে না। জানার বিষয় হলো, আমার পেছনে সুস্থ ব্যক্তিদের নামায শুদ্ধ হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত মাযুর ব্যক্তি যথাযথ রুকু-সিজদা করতে সক্ষম হলে তার পেছনে নামায আদায় শুদ্ধ হলেও সুস্থ ব্যক্তিকে ইমাম বানানো উত্তম। (রদ্দুল মুহতার ২/৪০৮)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মোছা. খাদিজা খাতুন
গফরগাঁও, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

কোনো ব্যক্তি নিজ পুত্রের বউকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করল, চুমু দিল। এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে এর কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবে কি না, হলে কেন? না হলে এখন করণীয় কী?

সমাধান :

কোনো ব্যক্তি যদি নিজ পুত্রবধূকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে বা চুমু দেয় এবং এতে বীর্যপাত না হয় এবং স্বামীও বিষয়টি স্বচক্ষে দেখে বা সত্যায়ন করে তাহলে উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে এবং তালাকের মাধ্যমে পৃথক হয়ে যেতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৩৩)

প্রসঙ্গ : ফিদিয়া

মুহা. শাহজাহান আলম
গুলশান-২, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার ছেলে মুহা. মাহবুবুল আলম, সে ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে। এবং ২৭-১১-২০১১ ইং ইন্তিকাল করে। সে নামায-রোযার পাবন্দ ছিল। কিন্তু অলসতাবশত মাঝে মাঝে ছেড়েও দিত। এখন আমি তার নামায ও রোযার ফিদিয়া আদায় করতে চাই। জানার বিষয় হলো, নামায ও রোযার ফিদিয়ার পরিমাণ কত এবং কোন হিসেবে আদায় করব এবং কত টাকা ফিদিয়া দেব?

সমাধান :

মাইয়াত অসিয়ত করে গেলে ওয়ারিশগণের ওপর মৃত ব্যক্তির মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ফিদিয়া আদায় করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে অসিয়ত না করে গেলে বা তার মাল না থাকলে তার ওয়ারিশগণের ওপর ফিদিয়া আদায় করা জরুরি নয়। তা সত্ত্বেও ওয়ারিশগণ ফিদিয়া দিলে মৃত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। নামায ও রোযার ফিদিয়ার পরিমাণ হলো, প্রতি রোযা ও প্রতি ওয়াক্ত বিতিরসহ নামাযের জন্য ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা আটা অথবা তার মূল্য আদায় করে দেবে। প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হিসাব করে আদায় করলেই চলবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৭২, এমদাদুল আহকাম ১/৬৬৭)

প্রসঙ্গ : কোরবানীর চামড়া

হাফেজ আব্দুল জলীল
কাহালু জামে মসজিদ, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোরবানীর সময় চামড়ার টাকা কালেকশন করে এবং এই টাকা তারা সংগঠনের কাজে ব্যয় করে থাকে। যেমন তাদের নেতা-কর্মীদের চিকিৎসা বা তাদেরকে জেলবন্দি থেকে মুক্তি ইত্যাদির কাজে ব্যয় করে থাকে। জানার বিষয় হলো, তাদেরকে চামড়ার টাকা দেওয়া জায়েয হবে কি না?

সমাধান :

চার ইমাম এবং সমগ্র ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে যাকাত ইত্যাদি আদায় হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো, তার উপযুক্ত হকদারকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। যেহেতু জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদী সাহেব ওই শর্তকে জরুরি মনে করেন না। আর তিনি বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কাছে কোরআন-হাদীসের শিক্ষা অর্জন না করায় কোরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞানের অধিকারীও নন, তাই যারা মওদুদী সাহেবের অনুসরণ করে চলে তাদেরকে যাকাত, ফিতরা ও কোরবানীর চামড়ার অর্থ প্রদান করা আশঙ্কামুক্ত না হওয়ায় তাদেরকে দেওয়া সঠিক হবে না। (রদ্দুর মুহতার ২/৩৪৪)

প্রসঙ্গ : পর্দা, কদমবুছি

মুহা. রুবেল
বেলাব, নরসিংদী।

জিজ্ঞাসা-ক

বর্তমান যামানায় মহিলাদের মুখমণ্ডল, উভয় হাতের কবজি এবং পা পর্দার অন্তর্ভুক্ত কি না? এক আলেম বলেন এগুলো পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়।

জিজ্ঞাসা-খ

পীর সাহেবের কদমমুছি করা নারী এবং পুরুষের জন্য জায়েয আছে কি না?

সমাধান-ক

মহিলাদের মুখমণ্ডল, উভয় হাতের কবজি এবং পা নামাযের ভেতর পর্দার অন্তর্ভুক্ত না হলেও নামাযের বাইরে বেগানা পুরুষদের বেলায় অবশ্যই পর্দার অন্তর্ভুক্ত এ ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ একমত। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত আলেমের উক্তি সঠিক নয়। (সূরা আহযাব-৫৩, তাফসীরুল কাবীর ১২/২১৪)

সমাধান-খ

পীর সাহেবের কদমবুছি নারী-পুরুষ কারো জন্যই বৈধ নয়। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৮৩)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা. শামসুদ্দোহা
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

নামাযের ভেতর মহিলাদের পা সতর কি না? সতর হলে কতটুকু দেখা গেলে নামায ভেঙে যাবে।

সমাধান :

বিশুদ্ধ এবং আমলযোগ্য মতানুসারে নামাযে মহিলাদের পা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিধায় পা খোলা থাকলেও নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। (আল হিদায়া ১/৭৬, আদ্দুররুল মুখতার ১/৬৬)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা. শহীদুল ইসলাম
ঝিনাইদহ সদর।

জিজ্ঞাসা :

আমি এক মসজিদে ৮-৯ বছর ইমামতি করছি। সম্প্রতি কিছু মুসল্লিদেরকে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা নামাযে উচ্চস্বরে আমীন বলেন, বুকের ওপর হাত বাঁধেন এবং রফয়ে ইয়াদাইন করেন। এতে অন্য মুসল্লিদের নামাযে ব্যাঘাত ঘটে। এ সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেন যে, এভাবে নামায পড়াই সঠিক পদ্ধতি। অতএব, নামাযে আস্তে আমীন বলা, নাভির নিচে হাত বাঁধার ও রফয়ে ইয়াদাইন না করার শরয়ী দলিল এবং কোরআন-হাদীসের আলোকে নামাযের উত্তম পদ্ধতি বর্ণনা করলে উপকৃত হব। যারা আহলে হাদীস মতে আমল করছেন তাঁদের আমল সঠিক কি না? সঠিক না হলে তাঁদেরকে আমরা হানাফী মাযহাব মতে আমল করার আহ্বান করব কি না?

সমাধান :

নামাযে সূরা ফাতিহার শেষে আমীন বলা সুন্নাত কিন্তু ইমাম ও মুক্তাদীদের জন্য উচ্চস্বরে আমীন বলার নির্দেশনামূলক কোনো হাদীস পাওয়া যায় না বিধায় নিঃশব্দে আমীন বলা সুন্নাত। (জামিউত তিরমিযী ১/৫৮)

পুরুষদের জন্য সিনার ওপর হাত বাঁধার কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে নাভির নিচে হাত বাঁধার সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তাই নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে। (সুনানে আবু দাউদ ১/৪৮০)

রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় কিন্তু তা নবী করিম (সা.)-এর শুরু জীবনের নামাযে ছিল। জীবনের শেষ দিকের নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সহীহ হাদীসের আলোকে নবী করিম (সা.)-এর জীবনের শেষের দিকের নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন ছাড়া অন্য কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন ছিল না। তাই রফয়ে ইয়াদাইন না করা সুন্নাত বলে বিবেচ্য। এটাই নামাযের সঠিক পদ্ধতি,

যা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম ১/১৮১, জামিউত তিরমিযী ১/৫৯) সুতরাং এর বিপরীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে নামায আদায় করা সঠিক পদ্ধতি বলে গণ্য হবে না।

প্রসঙ্গ : ব্যাংক

প্রফেসর মুস্তাক আহমদ
পশ্চিম নাখালপাড়া, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। আমার পেনশনের সুবাদে পাওয়া টাকা ব্যাংক বা জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে মুনাফা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এখন উল্লিখিত ব্যবস্থা কতখানি শরীয়তসম্মত হবে?

(১) জাতীয় সরকারি সঞ্চয়পত্রের সুবিধা ৫ বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রয় করলে প্রতি ৩ মাস পর পর টাকা উত্তোলন করা যাবে। নির্ধারিত মুনাফা ১৩.১৯% হারে মুনাফা দেবে। উল্লেখ্য, ৫ বছর পূর্বে টাকা তোলা যাবে না। এভাবে টাকা খাটানো শরীয়তসম্মত কি না?

(২) ইসলামী ব্যাংক অথবা আল-আরাফাহ্ ব্যাংকে যদি ৩ মাস মেয়াদি টাকা রাখা হয় তবে ব্যাংক ১১%-১২% হারে মুনাফা দেবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ভাষ্য মতে মেয়াদ শেষে নির্ধারিত হতে পারে।

(৩) এ ছাড়া আপনাদের জানা মতে শরীয়তসম্মত টাকা খাটানোর ব্যবস্থা থাকলে অনুগ্রহ করে জানালে উপকৃত হব।

(৪) সরকারিভাবে মহিলাদের জন্য পারিবারিক পেনশন স্কিম চালু করেছে। শতকরা ১৪-৪৫% হারে মুনাফা দেবে প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে মুনাফা দেবে। এর লাভ-লোকশানের কোনো বিষয় নেই। এইভাবে টাকা খাটানো জায়েয আছে কি না?

সমাধান:

(১) সুদি ব্যাংকে টাকা রেখে অথবা সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে মুনাফা অর্জন সুদি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা নাজায়েয তথা শরীয়তসম্মত নয়। (সূরা বাকারা-২৭৬)

(২) আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের দাবি অনুযায়ী শরঈ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত এবং শরীয়াহ কাউন্সিল তার তদারকি করে থাকে বিধায় তার বিপরীত প্রমাণিত না হলে সেখানে টাকা খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করা অবৈধ বলা যাবে না। (সহীহ মুসলিম শরীফ ২/২৭)

(৩) অর্থ বিনিয়োগের শরীয়তসম্মত অনেক পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে উক্ত পদ্ধতি হলো বিশ্বস্ত লোক দ্বারা মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করা। (রদ্দুল মুহতার ৫/১৬৬)

(৪) প্রশ্নে বর্ণিত পারিবারিক পেনশন স্কিম সুদি কারবারের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা নাজায়েয তথা শরীয়তসম্মত নয়। (ফিক্বহী মাকালাত ৩/৩১)

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

বিনয় ঐকমত্যের মূল

হযরত মওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলতেন, ঐকমত্যের মূল হলো 'বিনয়'। যদি প্রত্যেকেই অন্যকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করে তাহলে মতানৈক্যের সুযোগই আসবে না। কেননা মতানৈক্য এ জন্যই সৃষ্টি হয় যে, প্রত্যেকে নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম মনে করে। (আহলে দিল কে আনমূল আকওয়াল ৪৯)

নসীহত করার সুন্দর পদ্ধতি

জনৈক বড় লোক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ভক্ত ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব ছিল। এমনকি জুমু'আর দিন একই জায়গায় গোসল করতেন। কিন্তু তার লেবাস পোশাক শরীয়তপরিপন্থী ছিল। একদা হযরত নানুতবী (রহ.) তাঁকে বললেন, খান সাহেব! যেহেতু আপনার সাথে আমার পুরাতন বন্ধুত্ব তাই দুজনের লেবাস পোশাক দুই ধরনের হওয়া আমার ভালো মনে হচ্ছে না। তাই যখন আজ গোসল করতে আসবেন কাপড় দুই জোড়া নিয়ে আসবেন। এক জোড়া আপনার জন্য অন্য জোড়া আমার জন্য। আজ আমিও আপনার মতো লেবাস পরিধান করব। এ কথা শোনার পর খান সাহেব মনে মনে লজ্জিত হলেন এবং সেদিন থেকেই শরয়ী লেবাস পরিধান করা শুরু করলেন। (প্রাগুক্ত ৫৬, আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যা)

রিয়া কাকে বলে?

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী (রহ.) এক ব্যক্তিকে বড় আওয়াজে যিকির করার তালীম দিলে সে বলল, হযরত বড় আওয়াজে যিকির করলে তো রিয়া (আত্ম প্রদর্শন) হবে। তাই ছোট আওয়াজে যিকির করে নিই। প্রত্যুত্তরে হযরত বললেন, জি হ্যাঁ, সেখানে রিয়া নেই? যে গর্দান ঝুঁকিয়ে বসে যাবে। চাই সে অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ো; কিন্তু যারা দেখবে মনে করবে জানি না মনে হয় আরশ কুরসী পর্যন্ত ভ্রমণ করে আসছে। অথবা লাওহে কলম। পরে বললেন, জনাব! প্রকাশ্যে কোনো আমল করার নাম রিয়া নয়। বরং লোক দেখানোর নিয়্যতে আমল করার নামই রিয়া।

অসচ্চরিত্রের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা

হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) বলেন, অসৎ চরিত্র দূর করে সংশোধনের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা হলো ১। চিন্তা ও ধৈর্য। অর্থাৎ যেই কাজ করবে প্রথমে চিন্তা করবে কাজটি বৈধ না অবৈধ। এবং তাড়াতাড়ি করবে না বরং ধৈর্যের সাথে কাজ করবে। ২। অবগত করা এবং আনুগত্য করা। অর্থাৎ নিজের অবস্থা ও আমল সম্পর্কে শায়খকে অবগত করবে এবং তার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবে। ৩। অনুসরণ ও আস্থা। অর্থাৎ শায়খের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এবং যা কিছু বলবেন তার ওপর আস্থা রাখবে। (মলফূজাতে কামালাতে আশরাফিয়্যা)

প্রকৃত আলেম কে?

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) বলেন, হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন, প্রকৃত আলেম সে ব্যক্তি, যে একান্তে ও জনসম্মুখে আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ পাক যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ পাক যা অপছন্দ করেন, সে তা ঘৃণা করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, অধিক হাদীস জানার নাম ইলম বা জ্ঞান নয়। ইলম হলো আল্লাহ পাককে অধিক ভয় করা।

হযরত রবী বিন আনাস (রহ.) বলেন, যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে না সে আলেম নয়।

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, আলেম সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।

হযরত সা'আদ বিন ইবরাহীম (রহ.)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে মদীনার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ (ফিকাহ বিশারদ) কে? উত্তরে তিনি বললেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে, সেই বড় ফকীহ। (তাফসীরে মারিফুল কোরআন ৭/৩৩৭)

বাস্তব অপমান কী?

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, বাস্তব অপমান ও অসম্মান হলো নিজের প্রয়োজন (আল্লাহ ব্যতীত) অন্যের নিকট পেশ করা। ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা জুতা, তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করা কখনো অপমান নয়। (কামালাতে আশরাফিয়্যা)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩